শ্রীহেম চট্টোপাধ্যায়

মূল্য ৸০ আনা

প্রকাশক
বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স্ লিঃ
স্বত্বাধিকারী—আশুতোষ লাইব্রেরী
৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ;
৩া৮নং জনসন রোড, ঢাকা

দ্বিতীয় সংস্করণ
১৩৫১

মুদ্রাকর
শ্রীপরেশনাথ ব্যানার্জ্জী
শ্রীনারসিংহ প্রেস
৫নং কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা

টো-টো কোম্পানীর ম্যানেজার ... ১— ১৬ পৃষ্ঠা

দুই রাত্রি ... ... ১৭— ৪২ „

দা'ঠাকুরের শিলং-ভ্রমণ ... ৪৩— ৫৮ „

চরকুহকী ... ... ৫৯— ৮২ „

পচা ঘোষাল ... ... ৮৩— ৯৬ „

পূজা-কন্‌সেসন ... ... ৯৭—১১৪ „

টো-টো কোম্পানীর ম্যানেজার

বালিগঞ্জে টো-টো কোম্পানীর একটা ব্রাঞ্চ অফিস আছে, তার ম্যানেজার শ্রীবিনীত সেন। এই কোম্পানীর সভ্য যারা, তারা সবাই ম্যাট্রিক পাশ করতে পারে নি এবং নন-ম্যাট্রিকই হচ্ছে এই কোম্পানীর সভ্য হওয়ার উপযুক্ত কোয়ালিফিকেসন। বিনীত সেন আজ তিন বছর আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে দেখেছে, ম্যাট্রিক পাশ করতে পারে নি। ম্যাট্রিক পাশ করার মত এমন কঠিন কাজ জগতে আছে কিনা সন্দেহ। বিনুর বৌদির বিশ্বাস, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকদের সাথে বিনুর নিশ্চয়ই একটা ঝগড়া-কলহ গোছের কিছু আছে; নইলে এ-যুগে মেয়েরা পর্য্যন্ত পাশ ক'রে যাচ্ছে, আর বিনু পারে না, এ কি একটা কথার কথা।

হল! পরীক্ষার ফল বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই বিনু ঠিক করলে, একটা কিছু না করলে আর চলছে না। পাড়ার জন কয়েক তরুণ এ বিষয়ে অগ্রণী হয়ে সম্প্রতি একটি কোম্পানী গ'ড়ে তুলেছে। কিংবদন্তী এই যে—কোম্পানীর মূল অফিস কোথায়, এখনও তা ভাল ক'রে জানা যায় নি।

কল্যাণ, অরিন্দম, সুব্রত, সুচিত এবং বারীন এরা সব এই কোম্পানীর আদর্শ সভ্য। এরা কেউ জজের ছেলেও নয়—হাকিমের নন্দন, ব্যারিষ্টার-তনয়, ইঞ্জিনিয়ার-অনুজ কিংবা জমিদার-পুত্রও নয়! সন্ধ্যাবেলা সবাই মিলে কোরাস্ গান করে; চা-পান, চানাচুর-ভক্ষণ এ কোম্পানীর সভ্যদের কর্ত্তব্যের প্রধান অঙ্গ এবং সুদীর্ঘ আলোচনা, হল্লা এবং শেষ পর্য্যন্ত উদ্দাম নৃত্যের পর এদের প্রাত্যহিক নৈশ অধিবেশনের পরিসমাপ্তি হয়।

সেদিন বেশ বৃষ্টি হচ্ছিল। সুব্রত ফস্ ক'রে ব'লে উঠল—"আচ্ছা বল দিকি পৃথিবীর কোন্ জায়গায় সব চেয়ে বেশী বৃষ্টি হয়?"

সুচিত বললে—“আমেরিকায়।”

বারীন বললে—“লণ্ডনে।”

কল্যাণ হাসিমুখে বিজয়গর্ব্বে ব’লে উঠল—“তা’ আর জানি নে! আমার মাসীমা থাকেন কুচবিহারে, সেখানে যা’ বৃষ্টি হয়,……”

বাধা দিয়ে বললে অরিন্দম—“নো, নো ব্রাদার, চেরাপুঞ্জি—আসামে।”

সুব্রত হাতে তালি দিয়ে বললে—“ব্রেভো!”

বিনীত সেন সায় দিয়ে বললে—“শিলঙের কাছে।”

আর কি কথা আছে, সভ্যেরা কোরাস্ সুরে গান ধরলে—

“শিলং পাহাড়, বৃষ্টি-আগার কাজল মেঘের আবাসভূমি—
নব মেঘদল ঘোরে অবিরল, সদাই দেখিতে পাইবে তুমি।
কুঞ্জে কুঞ্জে নব ফুলহার সবুজ বনানী হাওয়ায় দোলে;
অপরূপ তার সুনীল গগন, পাগ্‌লা-ঝোরায় পথিক ভোলে।
চল চল সবে কে আছ কোথায় যেতে চাও যদি রবে না পিছে,
দার্জ্জিলিঙ আর শিলং পাহাড় যে না দেখেছে জীবনই মিছে!”

সুব্রত কবি, সুব্রত গায়ক, সুব্রত প্রিয়দর্শন,

চোখের নিমেষে সে কল্পনায় শিলঙের একটা আঁচ ক'রে নিয়ে সঙ্গীতটি রচনা ক'রে ফেললে !

রাত্রি বোধ করি তখন প্রায় দশটা বাজে। পাড়ার লোকেরা কোথাও অগ্নিকাণ্ড কিংবা ডাকাত পড়েছে ভেবে ছুটে এল ; এসে দেখে ছোকরার দল মহোল্লাসে নৃত্য ক'রে কোরাস্ গানের মহড়া দিচ্ছে ! পাড়ার লোকজন দেখে তাদের উৎসাহ আরও দ্বিগুণ বেড়ে গেল। পাড়ার বৃদ্ধ দা'ঠাকুর উঁকি মেরে মন্তব্য করলেন—"ব্ল্যাক-আউট ক'রে কর্পোরেশনের কর্ত্তারা দেখি মারাত্মক ব্যাপার ক'রে তুললেন। ছেলের দল এখন সন্ধ্যাবেলা কোথায় যায়, পাড়াটা মাথায় ক'রে তুলেছে যে ! দেখি কাল একবার কর্ত্তাদের ওখানে গিয়ে..."

সে যা-ই হোক না কেন, অন্ততঃ দা'ঠাকুর এবং তাঁর প্রতিবেশীরা দিন কয়েকের জন্য একটু নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন, কারণ টো-টো কোম্পানী এক সপ্তাহের জন্য খাসিয়া পাহাড়ে স্থানান্তরিত হচ্ছে। আজ সভায় সে সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা,

ছোকরার দল কোবাস্ গানের মহড়া দিচ্ছে

তর্ক-বিতর্ক, এমন কি হাতাহাতি হবার উপক্রম হয়েছিল।

আশ্বিনের দ্বিতীয় সপ্তাহে টো-টো কোম্পানীর সভ্যেরা শিলং যাত্রা করবে এরূপ এক রকম স্থির হয়ে গেছে। ঠিক যাবার দিন দেখা গেল একমাত্র বিনীত সেন শিলংভ্রমণে যাত্রা করছে। কারণ অন্যান্য সভ্যেরা তাদের আত্মীয়-স্বজন থেকে তেমন কিছু টাকা-কড়ি সংগ্রহ করতে পারে নি, যা নিয়ে তারা বিদেশ-যাত্রা করতে পারে।

সবাই যার যার বাড়ী থেকে ছলে, বলে, কৌশলে যা-কিছু নিয়ে এসেছিল, সবই বিনীত সেনের কাছে এনে হাজির করলে। বিনীত সেন ত মহাখুশী। সে মাত্র দশটি টাকা শিবপুর গিয়ে তার মামার কাছ থেকে কোন মতে নিয়ে এসেছিল, তা'ও আবার তার মার নাম ক'রে। আর কেউ সিকি আধুলির বেশী বাড়ী থেকে চেয়ে আনতে পারে নি।

এজন্যই বিনীত সেন এ দলের ম্যানেজার। শুধু তাই নয়। টো-টো কোম্পানীর ম্যানেজার

যিনি হবেন, তিনি অন্ততঃ ভারতবর্ষের সুপ্রসিদ্ধ দশ-দশটি সহর তন্ন-তন্ন ক'রে দেখে আসবেন এবং সভ্যদের কাছে তার পরীক্ষা দিতে হবে দস্তুরমতভাবে! সেখানে পরীক্ষক থাকবেন এমন লোক যিনি একাধিক মাস কাল সে-সহরে বসবাস ক'রে সমস্ত তথ্য জেনে-শুনে এসেছেন।

মবলক সতের টাকা পনেরো আনা সম্বল ক'রে বিনীত সেন শিলং যাত্রা করলে। সভ্যেরা ষ্টেশনে এসে কোরাস্ গান গেয়ে তাকে বিদায়-অভিনন্দন দিচ্ছে। শিয়ালদ' ষ্টেশনে একে পূজোর ভীড়, তার উপর লোকজন, মুটে-মজুর, ফেরিওয়ালার ছড়াছড়ি। প্ল্যাটফরমে ঐ ধরণের একটা কোরাস্ গান শুনে সবাই চমকে উঠল। লোকজনের ছুটোছুটি, যাত্রীর হুল্লোড়ে প্ল্যাটফরমখানি একেবারে সরগরম হয়ে উঠেছিল, তার উপর আবার সভ্যদের এই কোরাস্ সঙ্গীত!

কয়েকজন কলেজের মেয়ে পূজোর ছুটিতে দেশে যাচ্ছে, তারা ছিল ঠিক পাশের গাড়ীতেই। তারা

ভাবলে হিন্দুসভার কোন নেতা বুঝি আসামে বক্তৃতা করতে যাচ্ছেন। কারণ বিনীত সেনের গলায় ফুলের মালার ছড়াছড়ি, বিদায়-অভিনন্দনের বহর আর সভ্যদের হাতে রক্ত নিশান দেখে তারা তাই মনে করেছিল। বিনীত সেনের আর কিছু না-ই বা থাকুক, চেহারাটি বেশ মোলায়েম, নাদুস-নুদুস এবং বেশ ফর্সা রঙের সুঠাম দেহখানি। হাসিমুখে সকলের সাথে কথা বলা বিনীত সেনের একটা প্রধান গুণ।

একদল ফিরিঙ্গি সেখানে দাঁড়িয়ে এসব ব্যাপার দেখে শুনে অবাক হয়ে গেছে। একজন মেম-সাহেব কৌতূহলভরে জিজ্ঞেস করলেন—"Who is going, Babu ?"

কল্যাণ এগিয়ে গিয়ে বুক ফুলিয়ে বললে—"Madam, Manager of the To-To Company !"

মেমসাহেব তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে—"Manager, Tata Company, I must

see him."—ব'লেই ভীড় ঠেলে গিয়ে দেখেন ধুতি-পাঞ্জাবী-পরা একটি তরুণ যুবক হাসিমুখে দাঁড়িয়ে সবার সাথে আলাপ করছে, অপর সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। মেমসাহেব ভয়ানক চটে' গিয়ে ষ্টেশন-মাষ্টারের উদ্দেশে ছুটে গেলেন। ঠিক তেমনি সময়ে আসাম-মেল অজগর সাপের মত বিরাট দেহখানি হেলিয়ে দুলিয়ে চ'লে যেতে লাগল।

ইণ্টার ক্লাস ভর্ত্তি এক দঙ্গল লোক। অবারিত মাঠের আশেপাশে বন-বাদাড়ের সাথে লুকোচুরি খেলে গাড়ীখানা ছুটে চলেছে। কত গ্রামের ধারে মাঠ, বন, বাবলাগাছ, খেজুরগাছ; দূরের অশ্বত্থগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে চাষীরা একদৃষ্টে চেয়ে আছে, বিনীত তাই দেখছে ব'সে ব'সে। পোড়াদ' আসতেই বিনীত নেমে গেল সেখানে; কারণ গোয়ালন্দ হয়ে চাঁদপুর ষ্টীমারে পদ্মা পাড়ি দিয়ে সে সিলেট হয়ে যাবে শিলং। সারারাত তাকে সেখানে কাটাতে হল, পর দিন দুপুরে ট্রেনে চেপে সে গেল গোয়ালন্দ। গোয়ালন্দ যেয়ে

পদ্মার একটু নমুনা দেখে বিনীত মনে মনে বললে—এই পদ্মানদী, আমাদের গঙ্গার চেয়ে একটু বড় মাত্র, তারই এত হাঁকড়াক শুনি কলকাতায় ব'সে!

কিন্তু যখন পদ্মার মাঝামাঝি এসে অত বড় ষ্টীমারখানি ঢেউয়ের দোলায় 'প্রলয় নাচন' নাচতে সুরু করলে, তখন "ওরে বাবা রে" ব'লে বিনীত সেন ষ্টীমারের ভিতর ছুটোছুটি করতে লাগল। কার সাধ্য তাকে বোঝাবে যে, এই পদ্মানদীর বুকে প্রতিদিন কত শত নৌকো, ষ্টীমার, জেলে-ডিঙি হেসে খেলে পারাপার হচ্ছে।

চাঁদপুর পোঁছে যেন তার দেহে প্রাণ ফিরে এল। তখন মোটে দশটি টাকা তার পকেটে আছে। সেই টাকা দিয়ে কি করবে, শিলঙে পৌঁছে তার একটা ব্যবস্থা হবে—একথা তার মনে মনে ঠিক ছিল। সিলেটের পথে সে সারারাত ঘুমিয়েছিল; ঘুম ভাঙলে, শিলঙের পাহাড়িয়া পথে দেখবার মত প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো সে মনে মনে মুখস্থ ক'রে মাঝে মাঝে আওড়ে নিচ্ছিল। ... ...

শৈলশ্রী হোটেলে পৌঁছে বিনু বিষম মুস্কিলে পড়ল, কারণ কেউ তাকে চেনে না, জানে না। পরদিন সবাই যখন শুনলে টো-টো কোম্পানীর ম্যানেজার এসেছে, তখন সে কি খাতির, সে কি আদর-যত্ন! ছেলেমানুষ ব'লে সবাই তাকে কলেজের ছাত্র ভেবে ততটা গ্রাহ্য করে নি, কিন্তু পরিচয় পাওয়া মাত্র সে কি আদর-আপ্যায়ন, স্বয়ং ম্যানেজারবাবু পর্য্যন্ত বিনুর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখছেন। আর কি কথা আছে, সহরে গুজব রটে' গেল—টো-টো কোম্পানীর মূলধন দশ লক্ষ টাকা, নিজেদের প্রকাণ্ড বাড়ী, সব এলাহী কাণ্ড-কারখানা! আজ রাম আসে, কাল শ্যাম আসে, দু'দিন বাদে মিঃ হ্যারি, মেহু, এমন কি সহরের জন কয়েক বেকার ম্যাট্রিক-ফেল ছোকরা বিনীত সেনের কাছে এসে করজোড়ে নিবেদন জানালে—"এখানে একটি ব্রাঞ্চ খুলতে হবে।"

বিনীত সেন অভয় দিয়ে বললে—"ব্রাঞ্চ খোলাই আমার কাজ, তাই ত দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াই।"

শিলঙে দেখবার মত যা-কিছু আছে বিনীত সেন সে-সব বার কয়েক খুঁটিনাটি ক'রে দেখে শুনে নিয়েছে। সেখানে গল্‌ফ কোর্স, বিসপ্‌ জলপ্রপাত, হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিকেল ইঞ্জিন ঘর, শিলং পিক, এলিফেণ্ট জলপ্রপাত, চেরাপুঞ্জি—সবই সে দেখে নিয়েছে। এক সাহেবি দোকান থেকে সে তিন তিনটি সুট বানিয়ে নিয়েছে। তাকে ক্রেডিটে মাল দিতে লোকে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করছে না। অত বড় কোম্পানীর ম্যানেজার, মাইনে বেশী না হোক অন্ততঃ পাঁচশ' টাকা নিশ্চয়ই,—এ সব জল্পনা-কল্পনায় শিলং সহর মুখরিত।

অন্যান্য সভ্যদের জন্য সে ছায়া-ছবি তুলে নিয়েছে। চমৎকার সব ছবি, সভ্যদের তাক লেগে যাবে! এসব কথা মনে মনে ভেবে বিনীত সেন উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। প্রতিদিন ভোরে ও সন্ধ্যায় সে পলো-গ্রাউণ্ডের ধারে বেড়াতে যায়, গল্‌ফ কোর্সের আশে পাশে ঘুরে আসে। সবুজ বনানী, গাঢ়নীল আকাশ, ফুরফুরে বাতাস তার মনে এক

অপূর্ব্ব কল্পনা-রাজ্য সৃষ্টি করে। সে ভুলে যায় বালিগঞ্জের কথা, লেকের কথা—শিলঙের ওয়ার্ডস লেকের ধারে ব'সে সে স্বপ্ন দেখে কাশ্মীরের, বিলাতের! গভর্ণমেণ্ট হাউসের ধারে ফুলের বন-উপবন তার প্রাণ-মন হরণ ক'রে নিয়ে যায় কোন্ অজানা দেশে কে জানে! খাসিয়াপাড়ার বাইরে ওমখ্‌রা নদীর ধারে সে ঘুরে ফিরে বেড়ায়। কোন দিন নদীর চিক্‌মিকে জলে ঝিক্‌মিকে নুড়ি দেখতে দেখতে বালির রেখায় তার মন মিশে যায়; আর কোন দিন, নদীর গেরুয়া রঙের বিপুল বারিরাশি ভীম গর্জ্জনে তটের প্রান্তে ভাঙন ধরিয়ে দিয়ে বুকে সাদা ফেনার ফুল ফুটিয়ে রকমারি শব্দে ছুটে যায়—সে তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। অদূরে লোবাঙ পাহাড় দূরের পথিককে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে। ঝিঁঝির গানে মুখরিত সরল বনের আলো-ছায়ায় ব'সে খাসিয়ারা কাঠ কাটছে একমনে। বিনীত সেন ঘুরে ফিরে এসব দেখে-শুনে হয়রান হয়ে ঘরে ফিরে আসে, ক্লান্ত দেহ এলিয়ে

দেয় কোমল বিছানায়, তারপর নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে। … …

হঠাৎ একদিন ভোরে দেখা গেল টো-টো কোম্পানীর ম্যানেজার শিলং থেকে উধাও হয়েছে —তার বিছানা, ট্রাঙ্ক, সুটকেস সবই যেমন ছিল ঠিক তেমনি প'ড়ে আছে। কে বিশ্বাস করবে যে জিনিসপত্র রেখে ভদ্রলোক পালিয়েছে।

খোঁজ খোঁজ রব, পুলিশে খবর, ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি ক'রে দেখা গেল, বিছানা বলতে কিছুই নেই। একখানি সস্তা দামের জাপানী কম্বল দিয়ে ঢাকা স্প্রিঙের খাটখানি শূন্য প'ড়ে আছে, আর ট্রাঙ্ক-সুটকেসে যত পুরণো খবরের কাগজের টুকরো। হোটেলের ম্যানেজারবাবু মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়লেন। ক্রমে ক্রমে খবর পেয়ে সবাই এলেন বিলের পাওনা আদায় করতে, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা!

কলকাতায় খোঁজ খবর ক'রে জানা গেল—অরসিক মুদীর লেন ব'লে কোন রাস্তাই নেই এবং টো-টো কোম্পানী ব'লে কোনও রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠান

ম্যানেজারবাবু মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়লেন

কলকাতা সহরে নেই। মিঃ বি. সেনের নাম কেউ বলতে পারলে না, কত 'সেন' প'ড়ে আছে এক একটা অলি-গলিতেই! পাড়ার বুড়ো ঠাকুর্দ্দা রসিকতা ক'রে বললেন—"অরসিক মুদীর লেন না পাওয়া যায়, রসিক মুদীর লেন পাওয়া যায় কিনা একবার খোঁজ ক'রে দেখুন না। টো-টো কোম্পানীর ম্যানেজারকে আর কোথায় পাবেন মশায়, তিনি টো-টো ক'রে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন কে জানে।"

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি যে, টো-টো কোম্পানী এখনও উঠে যায় নি, এবং এই ব্ল্যাক-আউটের দিনে তাদের সভ্য-সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে' চলেছে। কোম্পানীর ম্যানেজারবাবুও অক্ষতদেহে সুস্থশরীরে বালিগঞ্জে বিরাজ করছেন। একথা শোনা কথা নয়, ঢাকুরিয়া লেকের ধারে তাদের কোরাস্ গান নাকি আদর্শ মূক-বধির বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা শুনে এসেছে। আমরা এদের কার্য্যালয় সম্বন্ধে সবাইকে একটু অনুসন্ধান করতে অনুরোধ করছি।

দুই রাত্রি

ছোড়দির সঙ্গে ঝগড়া ক'রে একদিন রাত্রিবেলা বাড়ী থেকে পালিয়ে এলাম। মা-বাপ ছোটবেলায়ই মারা যান। ছোড়দি বহু কষ্টে এই বাপ-মা-মরা ডানপিটে ছেলেটিকে মানুষ করেছিলেন। বড় ভালবাসতেন তিনি আমাকে। এত স্নেহ জীবনে আমি আর কারও কাছে পাব কিনা সন্দেহ। সেই স্নেহের আতিশয্যে আমার কথায় কথায় ছিল অভিমান—একটু কিছু কেউ বললে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসত।

রাত্রি বারোটা বাজে। প্রথম গিয়ে স্থান নিলাম আমার প্রিয় সহচর বকুলগাছটার বুকে। পাকা বকুল খেয়ে খেয়ে গলাটা খুস্‌খুস্ করতে লাগল। ধীরে ধীরে গাছ থেকে নেমে পড়লাম। পাশেই ছিল ভুতোদের বাড়ী। ভাবলাম—ভূতোকে ডাকি, দেশটা ছাড়বার আগে একবার

ভূতোর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ক'রে যাই। দেশটা ছেড়ে যেতে কী যে কষ্ট হচ্ছিল, সেইটি বুঝতে পেরেছিলাম রেলগাড়ীতে চ'ড়ে,—যখন গাড়ীটা হুহু ক'রে দ্রুতবেগে চলতে লাগল। ছোড়দির জন্য কত কান্নাই না কেঁদেছিলাম। মনে পড়ল, ছোড়দি হয়ত আমার জন্য সারারাত ব'সে চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে চেয়ে আছেন। বাড়ীর পাশ দিয়ে যে পথটা অনেক দূরে চ'লে গেছে, তার উপর জনমানবের সাড়াশব্দ পেয়েই হয়ত মনে ভাবছে—'এই বুঝি ফিরে এল!'

ভুতোর সঙ্গে দেখা করলাম না ভয়ে, কি জানি শেষে যাওয়াই বা না হয়! রাগের মাত্রাটা ছিল পূরোপূরি; সেই ঝগড়ার কথাটা মনে পড়ায় তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম প্ল্যাটফরমে। সঙ্গে ছিল মোটে তিনটি টাকা। ছোড়দি জলখাবারের যে পয়সা ক'টি দিতেন, তাই জমিয়ে জমিয়ে এই তিনটি টাকা আমার সম্বল হয়েছিল। তাই নিয়ে নিরুদ্দেশের যাত্রী হয়ে পথে বেরিয়েছি।

গ্রাম ছেড়ে কখনও বিদেশে যাই নি। আমার ভ্রমণকাহিনী লিখতে হলে, বাড়ী আর স্কুল,…… আ…র মধুপুরের হাট।…অবশ্য ছবিতে আমি অনেক দেশ ও প্রসিদ্ধ লোকদের ফটো দেখেছি।

গাড়ীতে গদীর উপর শুয়ে আছি। যেমন গরম, তেমনি মশা আর ছারপোকার উৎপাত, কার সাধ্য একটু চোখ বোজে? এখন দেখি যে রাগ না করাই ছিল ভাল, বাড়ীতে বিছানায় শুয়ে দিব্যি আরামে কত না সুখের স্বপ্ন দেখতে পারা যেত!

সঙ্গে ছিল না কিছুই। কলকাতায় গিয়ে কোথায় উঠব? কার বাড়ীতে গেলে একমুঠো ভাত দেবে? মোটে ত সম্বল এক টাকা সাড়ে পাঁচ আনা! হ্যাঁ…হ্যাঁ মনে পড়েছে,—ঠিক ঠিক মণ্টির মাসীমায়েরা কলকাতায় থাকেন। বেশ হয়েছে, মজা হয়েছে, মণ্টির সঙ্গে দেখা হবে,—তারপর মাসীমা কত আদর করবেন, কত গাড়ী-ঘোড়া!

আহা-হা…তাঁদের ঠিকানা ত মনে নেই! তা

যাকগে—ষ্টেশনে নেমেই কাউকে জিজ্ঞেস ক'রে নেব। মণ্টিকে না চেনে, তার মাসীমার কথা বললে সবাই চিনে ফেলবে। বুড়ো মানুষ, পাঁচ বছর কলকাতায় আছেন। না হয়, পাড়ার ছেলেদের কাছে ।জজ্ঞেস ক'রে নেব…সেই যে মণ্টি,—রঙ্ খুব ফর্সা, ট্যারা চোখ, বাঁশী বাজাতে পারে,—না চিনে আর জো আছে! আমাদের স্কুলের একটি ছেলের নাম করুক দেখি? এক সেকেণ্ডে ব'লে দেব—ষোড়শী…দীনুবাবুর ছেলে। পেঁচো…ট্যারা পেঁচো…ভুবন দারোগার ছেলে, আর ফর্সা পেঁচো…ঘোষালদের ছেলে, বড়কু…মহেশবাবুর ছেলে। কেমন পারি কি না?…হেঁ হেঁ……

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ঠিক নেই। কি একটা ষ্টেশনে জেগে দেখি, বেশ মিষ্টি ফুলের সৌরভ ভেসে আসছে,—বোধ করি যূঁই ফুলের। অন্য সময় হলে বলতাম চামেলি।

জ্যোৎস্না তখনও অস্ত যায় নি। চাঁদমামা মেঘের ভিতর দিয়ে লুকোচুরি খেলছেন। জানালা

দিয়ে তাই দেখ্‌তে দেখতে আবার একটু ঘুমের ভাব এল।

এমন সময় জন কয়েক লোকের কলরবে জেগে উঠলাম। ওরে বাপরে!...দু'জন লোক এসে আমায় ধরাধরি ক'রে—এক রকম জোরজবরদস্তির মাঝে গাড়ী থেকে প্ল্যাটফরমে নিয়ে গেল। আর একজন—ইয়া মস্ত গোঁফ, মৃদু হেসে বললেন—"দুষ্টু খোকা, এমনিভাবে পালিয়ে আসতে হয়?"

আমি ভাবলাম বুঝি দাদাবাবু, ছোড়দি...কিন্তু সে চেহারার মৃদুহাসি দেখেই আমি ভয়ে আঁতকে উঠলাম। ভদ্রলোকটিকে আমি ইহজীবনে ত দেখিই নি, বোধ করি পূর্ব্বজন্মেও না।

আর একজন এসে জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে লাগলেন—"ওরে বাবা, এমনিভাবে পালিয়ে যেতে হয়? তোর জমিদারী, তোর রাজ্য কে আর ভোগ করবে? তুই যে সবেধন নীলমণি।"

ষ্টেশন-মাষ্টার বিশ্রী একটা আলো মুখের উপর ফেলে বললেন—"কাজলপুরের কুমার

সাহেবের জন্য পাল্কীর বন্দোবস্ত হয়েছে, এই যে বেহারারা নিয়ে আসছে।”

আর একজন লাফ মেরে ব’লে উঠল—“আহা করেন কি, করেন কি মশায়, কুমার সাহেবের চোখ ঝলসে যাবে।”

বেচারী ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে পিছনে স’রে দাঁড়াল।

পাল্কী এসে কাছে দাঁড়াল। ভিতরে বালিশ, বিছানা! আমি লজ্জায়, ভয়ে পাল্কীর ভিতরে ঢুকে অবস্থাটা ভাববার জন্য দরজা বন্ধ ক’রে দিলাম।

সঙ্গের লোকগুলো হো-হো ক’রে হেসে উঠল।

আর একজন তখনই বললেন—“কুমার সাহেব রেগে যাবেন কিন্তু!”

আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম,—কাজলপুরের কুমার সাহেব,…ব্যাপারখানা কি?

পাল্কী চ’ড়ে বিয়ের বরের মত কোথায় চলেছি ঠিক বুঝতে পারলাম না। একি শ্রীঘরে নিয়ে যাচ্ছে, না কোথায়? বেহারারা এসে প্রকাণ্ড একটা রাজপ্রাসাদের কাছে পৌঁছল। প্রৌঢ়গোছের

একজন ভদ্রমহিলা, আর দু'জন ছোড়দির মত বালিকা এসে আমায় অভিনন্দন করল। একজন তরুণী ব'লে উঠল—"খোকা, মাকে প্রণাম কর।"

কথামত প্রণাম করলাম। ভাবে বুঝলাম, ইনিই মেয়েদের জননী। সুতরাং তরুণীরা আমার সম্পর্কে হল বোন। আমি চুপ হয়ে মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে আছি দেখে মা বললেন—"খোকা, ঘরে চল্। এই পাঁচ বছর আমাদের ছেড়ে কি

ক'রে ছিলি বল্ ত! লক্ষ্মী মাণিক্ আমার, মাকে ছেড়ে আর কোথাও যাস্‌নে কিন্তু!"

আমি একটু হেসে মাথা নেড়ে সায় দিলাম—"আচ্ছা।"

মেজদি যিনি, ভারী দুষ্টু; বললেন—"খোকা, আমাদের সঙ্গে কথা বলতে হয় না?"

বড়দি ধমক দিয়ে বললেন—"চুপ কর্ না চাঁপা, খোকার কি শ্রী হয়েছে, দেখ না? ক'দিন যাবত হয়ত খাওয়াই হয় নি।"

মেজদি হেসে হেসে চোখ টিপে বললেন—"বেশ হয়েছে, কেন রাগ ক'রে গিয়েছিল? তার শাস্তি এখন ভোগ করুক না!"

মা ইসারায় বললেন—"চুপ কর্ না চাঁপা।"

কি সুন্দর ঘর-বাড়ী আসবাব-পত্র, দেয়ালে ছবি! বাথরুমে হাত-মুখ ধোবার জন্য গিয়ে দেখি, আমাদের দেশের বাড়ীর ঘরগুলো এর কাছে আস্তাকুঁড়।

খাবার সময় আসনে ব'সে দেখি, কত রকমারি

খাবার। কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা খাব, এই নিয়েই দ্বন্দ্ব হচ্ছিল মনে। মা বিপদ থেকে বাঁচালেন,—কয়েকটা পদ বেছে বেছে দিয়ে বললেন—"খোকন, দিনের বেলা কি খেয়েছিস্‌?"

আমি মাথা নেড়ে বললাম—"কিছুই না।"

মার চোখ ছলছল ক'রে উঠল; বললেন—"আহা, বিদেশে, বিভূঁয়ে কত কষ্ট না পেয়েছিস্‌!"

বিছানায় শুতে গিয়ে দেখি, খাটের মাঝখানটা কেবল লাফাচ্ছে! যতই নাড়াচাড়া করছি, ততই জোরে ন'ড়ে উঠছে।

ভোরের বেলা ঘুম থেকে জেগে দেখি, হলদে রোদ এসে ঘরের ভিতর উঁকিঝুঁকি মারছে। মেজদি আমার বিছানার পাশে ব'সে ক্রমাগত খালি আমায় ঠাট্টা করছিলেন—"কি জংলী চেহারা নিয়ে এসেছে। গায়ের রঙ কেমন ময়লা হয়ে গেছে। সাবানের টবে চুবিয়ে রাখতে হবে। গায়ের সোনার রঙ্‌ কেমন কালো হয়ে গেছে! কাল যে আমি চিনতেই পারি নি! ননী এল—না কে এল।"

আমি চোখ রাঙ্গিয়ে বললাম—"এমনি বকিস্ ত, আবার পালাব কিন্তু!"

মেজদি তখন নরম হয়ে বললেন—"পালাস্‌নে ননী! আমাদের পাঁচটি নয়, সাতটি নয়, মায়ের পেটের একটি ভাই মাত্র; যাস্‌নে কোথাও। তুই ত জানিস্‌নে, তোর জন্য মা এ-ক'বছর আহার-নিদ্রা ভুলে ছিলেন। কত দেশে লোক পাঠিয়ে তোর খোঁজ-খবর করেছেন। তোর ত তার জন্য একটুকু দরদ নেই। মায়ের স্নেহ তুই কি বুঝবি ননী? সে নীল আকাশের মত অসীম—অনন্ত!"

সত্যই মনে মনে বললাম—মায়ের স্নেহ জীবনে কখনও আস্বাদ করি নি। কি ক'রে বুঝব, সে কেমন অসীম, অনন্ত, স্নিগ্ধ এবং শান্তিপ্রদ। ব্যাপারটা ভাল ক'রে জানবার জন্য বললাম—"মেজদি, আমার খবর তোমরা জানলে কি ক'রে শেষে?"

—"ম্যানেজারবাবু কলকাতা যাচ্ছিলেন, তুই নাকি সেই গাড়ীতে পালিয়ে চলেছিলি আর ধরা

প'ড়ে গেছিস। আচ্ছা ননী, এ-ক'বছর কোথায় ছিলি, কে তোকে খেতে দিয়েছে ?"

ননী উদাসভাবে বলল—"জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেছেন তিনি। এ বিশ্বজগতে খাওয়াপরার কখনও অভাব হয় মেজদি ?" … …

কয়েক মাস এমনিভাবে কেটে গেছে। ননী সুখে-শান্তিতে কাজলপুরে আছে। লেখাপড়ার আপদ নেই, না আছে স্কুলের তাড়াহুড়ো, না ছোড়দির বকাঝকা, না দাদাবাবুর শাসন।

ননীর চাকর-চাকরাণী, লোকজন, পাইক-বরকন্দাজের অভাব নেই। তার মেজাজও তেমনি হয়েছে। সে নিজের অবস্থা এখন ভাল ক'রে বুঝতে পেরেছে। সুতরাং সে মজা ক'রে খায়, দাসদাসীর উপর হুকুম চালায় আর কারও তোয়াক্কা সে বড় একটা রাখে না।

ছোড়দির কথা সে একেবারে ভোলে নি। মাঝে মাঝে তার কথা খুব মনে পড়ে। শৈশবের সেই সুখের নীড় কে কবে ভুলতে পারে ? শত

হলেও ভাইবোন ছিল তারা, রক্তের টান বড় কম নয়। এখানে যে দুটি ভগিনী তার জুটেছে চাঁপা আর যূঁই—তাদের সঙ্গে ননীর বড় একটা খাপ খায় না। কারণ জন্মাবধি তারা ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে লালিত-পালিত, আর ননী চির-দারিদ্র্যের অভিশাপ নিয়ে পৃথিবীতে জন্মেছিল। চিরদিন কারও সমানভাবে যায় না। আজ যে রাজা, কাল সে পথের ভিখারী। অদৃষ্টের পরিহাস বটে।

একদিন সকালবেলা কলকাতা হতে ননীর মামা টেলিগ্রাম করলেন যে, ননীকে কালীঘাটে গঙ্গার পারে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে দেখে তাকে তিনি ধ'রে বাসায় এনেছেন।

এই সংবাদ কাজলপুরে পৌঁছবামাত্র বিষম হৈ-চৈ সুরু হল। ননীর মা, 'শত্রুপক্ষের কারসাজি' ভেবে কথাটা উড়িয়ে দিলেন। ননী আপনাকে সামলে রাখল, কারও সাথে বড় একটা কথাবার্ত্তা কইল না। দিদিরা হেসেই খুন।

এই ব্যাপারের তিন-চার দিন পরে, ননীর

মামা নলিনীবাবু, ননীকে নিয়ে কাজলপুরে এসে পৌঁছলেন। ননী নলিনীবাবুকে বড় হয়ে কখনও দেখে নি, তাই ধরা প'ড়ে বড় গোলমাল করেছিল, কিন্তু নলিনীবাবু তাকে ছোটবেলায় বার দুই দেখেছিলেন, সুতরাং তাকে চিনতে বেশী বেগ পেতে হয় নি।

কিন্তু······দুই 'ননী' নিয়ে বিপদে পড়ল সকলেই। হুবহু একরকম চেহারা, একজন বেশ হৃষ্টপুষ্ট, আর একজন ক্ষীণ, মলিন মুখ। নলিনীবাবু হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। তিনি পূর্ব্বে এ ব্যাপার আদৌ জানতেন না। কারণ কার্য্যোপলক্ষে তাঁকে প্রায় বৎসরাধিক কাল কলকাতার বাইরে থাকতে হয়েছিল।

গাঁয়ের বৃদ্ধ-প্রৌঢ়, যুবক-শিশু, কেউ-ই প্রকৃত ননীকে চিনতে পারল না। সুতরাং পুলিশ এই রহস্য নির্ণয় করবার জন্য তৎপর হল। কিন্তু বহু কষ্টেও কোন কূল-কিনারা করতে পারল না।

কারণ—ছোড়দি তখন ইহ-সংসার ত্যাগ

করেছিলেন। তিনি বেঁচে থাকলে খবরের কাগজের সংবাদ ইত্যাদি শুনেও ননীর প্রকৃত তথ্য বের ক'রে দিতেন, কিন্তু আজ আর কে তা দিবে ? 'নকল ননী' কিছুতেই আত্মপ্রকাশ করতে চাইল না, বরং আদর-যত্নের মাত্রা তার উপরই অধিক বর্ষিত হত। 'আসল ননী' কর্ম্মফলে অনাদরে কাজলপুরেই বসবাস করতে লাগল।

নকল ননী ছয় মাস বসবাসের ফলে এই পরিবারের সকলই জেনে শুনে নিয়েছে, আর তার উপর মায়া, দরদ, স্নেহ এবাড়ীর সকলেরই জন্মে গেছে।

অপরদিকে আসল ননী পাঁচ বছর নানা স্থানে ঘুরে ফিরে সব ভুলে বসেছে !

... ...

দশ বছর পরের কথা ! নকল ননীই এখন কাজলপুরের কুমার সাহেব নামে পরিচিত। আসল ননী কলকাতায় তাদেরই স্থাপিত একটা অনাথ আশ্রমে থেকে সিটি কলেজে পড়ছে।

কৈশোরে সে লেখাপড়া শিখে নি, লেখাপড়া শিখে যে পেটের দায়ে তাকে অর্থোপার্জ্জন করতে হবে, একথা তার স্বপ্নের অতীত। কাজলপুরের জমিদারীর আয় এখন বার্ষিক সাত লক্ষ টাকা।

ননী মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করে; কত দুঃখ-কষ্ট সহ্য ক'রে সে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ফিসের টাকা দিয়েছেন একজন দয়ার্দ্রহৃদয় ভদ্রলোক। তিনি আলিপুরের ডেপুটি। ডেপুটি হরেনবাবু ননীকে বড় ভালবাসেন। তার ইতিবৃত্ত শুনে হরেনবাবু তাকে সাদরে গৃহে নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ননী ইচ্ছা ক'রেই তথায় যায় নি। সে বলে, অত সুখ তার সইবে না। সে রাজার ছেলে ছিল, এখন পথের ভিখারী হয়েছে, একথা ইহজীবনে ভুলবার নয়।

হরেনবাবুর এক ছেলে ও একটি মাত্র মেয়ে। ননী বিনয়ের সমপাঠী। বিনয় হরেনবাবুর ছেলে। বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে বিলাত যাবে। আর মেয়ে অমিয়বালা বেথুনে পড়ে।

বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর অনার্স পাশ করলে হরেনবাবুর অনুরোধে ননী অমিয়বালার পাণি গ্রহণ করে। হরেনবাবু সরকারের প্রিয় পাত্র ; তাই ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর মনোরঞ্জন ক'রে জামাতার জন্য একটি ডেপুটিগিরি যোগাড় করেন।

ননী এখন বর্দ্ধমানের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট।...

নকল ননীর কথা আমরা অনেক দিন ভুলে আছি। সে ননী এখন তরুণ যুবক। দেশের কাজে সে মন দিয়েছে। ছিল গরীবের ছেলে, তাই দেশের গরীব, দুঃখী, আতুরের জন্য তার কত দরদ। তার জমিদারীতে প্রজারা বেশ সুখে আছে। কারও কোন দুঃখ-অভাব নেই। দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় যে দেশের বড় একটা কাজ হয়, একথা সে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছে।

দেশের কাজের জন্য সে এবার এক লক্ষ টাকা দান করেছে। যাতে নারী-শিক্ষার বিস্তার হয় এবং বাংলার কৃষকেরা অন্ততঃ দু'বেলা পেট ভ'রে খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে তার ব্যবস্থার জন্যই।

বিনয় কিসের একটা ছুটিতে বৰ্দ্ধমানে বেড়াতে গিয়েছে। অমিয়র কাছে কুমার সাহেবের দানের কথা শুনে সে বড়ই আনন্দ পেল। সে বললে—"আমাদের দেশের জমিদারেরা কত টাকা-পয়সা অপব্যয় করেন; তাঁরা যদি দেশের প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করতেন, তবে আমাদের সোনার দেশে দুঃখ ছিল কিসের বল ত?"

অমিয় সায় দিয়ে বলল—"সে-কথা ঠিক দাদা। আজ এখানে ক'দিন থেকে একটা প্রদর্শনী হচ্ছে, চল না বিকেলে দেখে আসি।"

—"কিসের প্রদর্শনী?"

—"জাতীয় প্রদর্শনী। আর সেই কুমার সাহেব তার সভাপতি।"

—"আচ্ছা, যাওয়া যাবে'খন।"

বিকেলবেলা তিনজনে প্রদর্শনী দেখতে গেল। নানা রকমের খেলনা পুতুল, খদ্দর, দেশী জিনিসের অভাব নেই। কুমার সাহেব একটা ষ্টলে ব'সে গল্প-গুজব করছিলেন।

ডেপুটি ননী চোখের ইসারায় বিনয় এবং অমিয়কে তা দেখিয়ে বলল—"ওই সেই কুমার সাহেব কাজলপুরের জমিদার।"

অমিয় কৌতূহলপূর্ণ চোখে একবার সেদিকে চেয়ে বললে—"দেখেছ দাদা, কেমন সুন্দর ভদ্রলোকটি! এত বড় জমিদার, কাজলপুরের কুমার সাহেব—অথচ একটুকু দেমাক নেই; কেমন সামান্য পোষাক প'রে ব'সে আছেন!"

বিনয় তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে দেখে বললে—"চমৎকার লোক কিন্তু।"

ননী হেসে বললে—"উনি এক সম্পর্কে আমার ভাই হন!"

অমিয় প্রশ্ন করল—"কি ক'রে?"

বিনয় আবার একটু হেসে বললে—"সেই বর্দ্ধমানের জাল প্রতাপচাঁদের কথা জানিস্ ত? অনেকটা সেই রকমের।"

ননী ম্লানমুখে বললে—"ঠাট্টা করো না বিনয়দা, একদিন মনে কি খেয়াল হল, দেশ ছেড়ে

চ'লে গেলাম। পাঁচ বছর পরে মামা ধ'রে আনলেন……"

অমিয় বাধা দিয়ে বললে—"ও বাবা, কি দুষ্টু ছেলে ছিলে তুমি ছোটবেলায়! বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়েছিলে!"

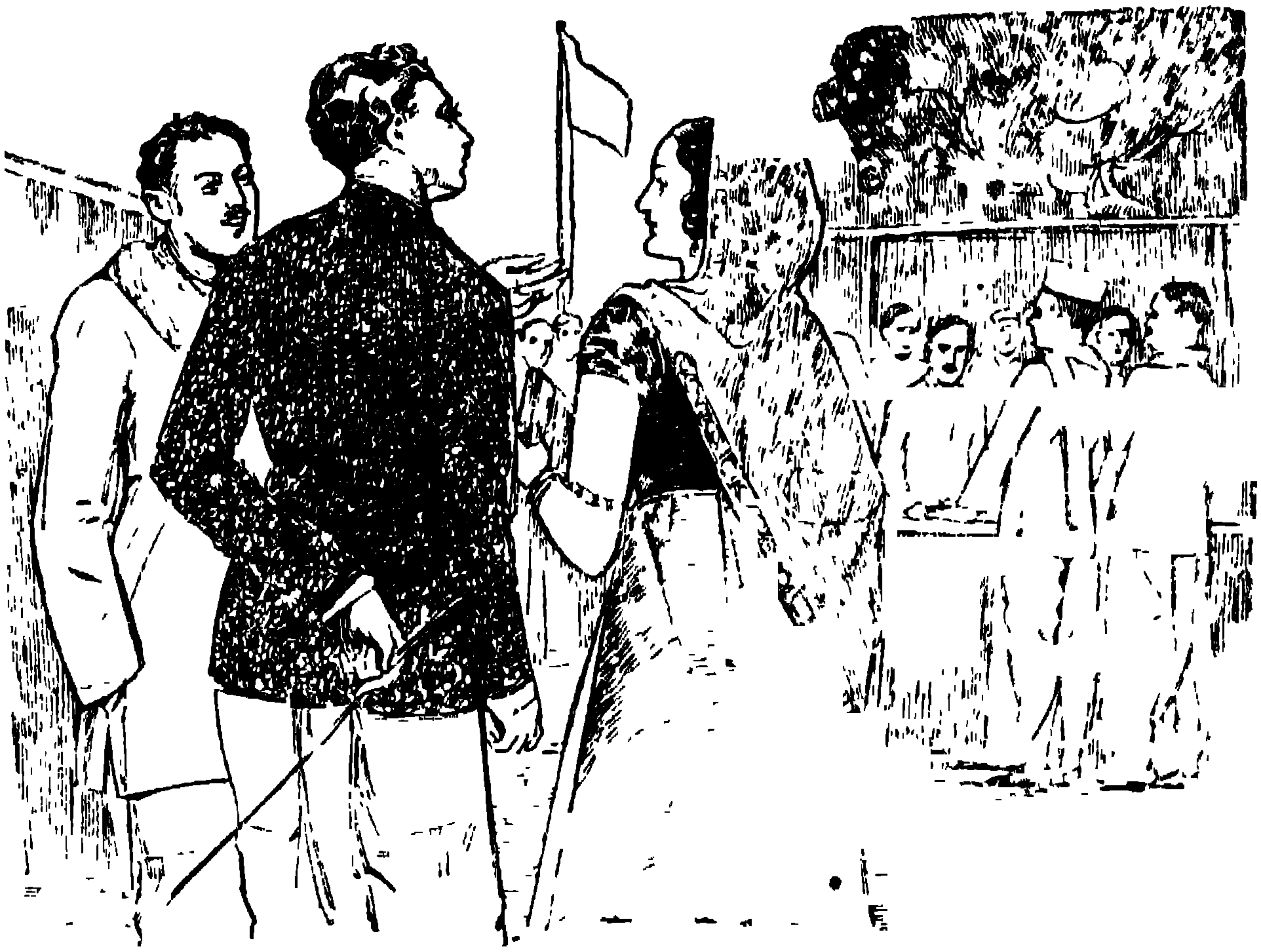

বিনয় বললে—"তারপর তোমায় কেউ চিনতে পারলে না?"

ননী গম্ভীরভাবে উত্তর দিল—"না।"

অমিয় বললে—"সে আমার বিশ্বাস হয় না। তা কি কখনও হয়? মা-বোন কখনও চিনতে পারলে না?"

ননী সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে বললে—"সে যাকগে—যা হবার তা হয়ে গেছে।"

অমিয় তখন পিছন ফিরে সেই কুমার সাহেবের দিকে ঈর্ষ্যান্বিত-নেত্রে চেয়ে থেকে সহসা বিস্ময় প্রকাশ ক'রে ব'লে উঠল—"দাদা, এ যেন আমাদের রঙিনদার মত দেখাচ্ছে না?"

বিনয়ও আড়চোখে চেয়ে জিজ্ঞেস করল—"কোন্ রঙিনদা রে?"

—"বাঃ রে, তোমার মনে নেই বুঝি, সেই যে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু রঙা।"

—"বলিস্ কি? আহা...রঙা কি এখনও বেঁচে আছে? সে কবে ম'রে ভূত হয়ে গেছে! জানিস, ছোড়দি মরবার সময় রঙার সঙ্গে দেখা হয় নি ব'লে কত চোখের জল ফেলে গেছেন। রঙা বেঁচে থাকতে পারে না, একথা আমি হলপ ক'রে বলতে পারি।"

উভয়ের অদ্ভুত আলাপ শুনে ননী বললে—"পথে দাঁড়িয়ে কেন হে? বাসায় চল, তার পর যত পার……"

অমিয় অভিমান ক'রে বললে—"আমরা আসছি, তুমি একাই যাও না।"

বিনয় আর একবার কুমার সাহেবের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—"রঙার চোখ দুটো এমনি ডাগর ছিল বটে! কিন্তু সে কোঁকড়ানো চুল…"

ননী হেসে বললে—"কোঁকড়ানো চুল, ডাগর চোখ—অনেকেরই থাকতে পারে……"

অমিয় ধমক দিয়ে বললে—"ধ্যেৎ! আমার রঙিনদার মত কোঁকড়ানো চুল আর ডাগর চোখ বর্দ্ধমান জেলায় অনেকেরই নেই, তা জান?"

ননী মৃদু হেসে জবাব দিলে—"এই দফা সেরেছে গো!"

বিনয় তখন জোর দিয়ে বললে—"ঠিক বলেছিস্, রঙাই বটে। একবার আলাপ-পরিচয়টা ক'রে আসি না!"

ননী বিনয়ের হাত ধ'রে বললে—"তুমিও শেষে বোনের মত ক্ষেপলে নাকি দাদা ?"

অমিয় বললে—"তুমি যাকে দেখ নি, তাকে নিয়ে অকারণ মাথা ঘামাও কেন ?…যাও না দাদা, আমাদের রঙাদাই বটে। ডেকে নিয়ে এস না তাকে, আমি না হয় আলাপ করব।"

শেষে ঠিক হল তিনজনেই তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করবে !

কুমার সাহেব তখন বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। বিনয় কাছে যেয়ে নমস্কার করলে।

নমস্কার গ্রহণ ক'রে কুমার সাহেব একটু হেসে বিস্মিত-নেত্রে গম্ভীরভাবে বললেন—"আপনাকে ত চিনতে পারলাম না। আপনি……"

বিনয় বললে—"আমি ভুতো…রতনদীঘির…"

কুমার সাহেব বোকা ব'নেই হাঁ ক'রে রইলেন।

বিনয় পুনরায় বললে—"রঙ্গ, আমাকে ভুলে গেলে ?" পরে অমিয়ের দিকে নির্দ্দেশ ক'রে বললে—"এই যে অমি, আমার ছোট বোন।"

কুমার ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললেন—"কোন্ রতনদীঘি, কই মনে ত পড়ছে না!"

পাশেই জন দুই পারিষদ্ দাঁড়িয়ে ছিল। একজন বললে—"বড়লোকের অনেক আত্মীয়-স্বজন থাকে হে। তোমার পিসীর না মাসীর দেশের লোক......"

আর একজন চোখ টিপে হেসে বললে—"যা-তা' বলছ কেন হে। ডেপুটিবাবু সঙ্গে আছেন। এঁকে তুমি নিশ্চয়ই জান। কেন? সেবার যে সত্যাগ্রহ ক'রে ক'মাস জেল খাটলে। মনে নেই বুঝি? ইনিই তো বিচার করেছিলেন।"

বিনয় সে কথায় কান না দিয়ে বলল—"রঙ্গ, তুমি স্বার্থের মোহে পশু হয়ে গেছ!"

অমিয় সায় দিয়ে মুখ ফিরিয়ে বলল—"কুমার সাহেবকে নিকনেম ধ'রে ডাকছ কেন দাদা? সে যে এখন বড়লোক। মুখ সামলে কথা কও।"

প্রথম পারিষদ্ মুখখানি কাঁচুমাচু ক'রে আড়ালে

গিয়ে দাঁড়াল। বিনয় পুনরায় বলতে লাগল—"সেই রতনদীঘির বকুলগাছে চ'ড়ে আমরা কত খেলা খেলেছি, সেই কাজলা নদীর বুকে সাঁতার কাটা, সেই তমাল বন, সব ভুলে গেছ, রঙ্গ? না, না……কুমার সাহেব। আমাদের ভুলে যেতে পার, কিন্তু জন্মভূমির কথা কেউ কি কখনও ভুলতে পারে? একসঙ্গে ব'সে কত পেয়ারা চুরি ক'রে খেয়েছি, সেবার দেশে বন্যা হয়েছিল, আমরা দু'জনে……"

বাধা দিয়ে অমিয় বলল—"শুধু কি তাই…… রঙ্গদা, আমার চুলের গোছা ধ'রে কত টেনেছ, তাও বুঝি ভুলে গেছ! ছোড়দি সেজন্য কত মার-ধর করেছেন!…আহা! ছোড়দি যদি আজ বেঁচে থাকতেন…"

জন্মভূমির কথায় কুমার সাহেবের মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, ছোড়দির কথায় সে একেবারে অধৈর্য্য হয়ে গেল। চোখ দুটি ছলছল ক'রে শেষে জলে ভ'রে এল। ধীরে ধীরে উচ্ছ্বসিত-

কণ্ঠে সে বলল—"ছোড়দি কি হয়ে মারা গেছেন অমি ?"

—"তোমার শোকে—দিবানিশি রঙ্গ, রঙ্গ ক'রে..."

... ...

আবার পথের পথিক !

রাত দুপুর প্রায়। কাজলপুরের বন্যপথ দিয়ে কে একজন আপনমনে গুন্-গুন্ ক'রে গান গেয়ে পথ চলেছে—

"রবে না সুদিন, কুদিন একদিন
দিনের সন্ধ্যা হবে।"

যুগপৎ মনে পড়ল, প্রথম রাত্রির কথা—আর আজ ?—

... ...

ননী আর কখনও কাজলপুরে ফিরে যায় নি। রঙিনের খবর কেউ আর জানে না। সে বোধ হয় বেঁচে নেই। ননী এখন আলিপুরে বদলি হয়েছে। তার একমাত্র পুত্র মণিলাল এখন কাজলপুরের

নাবালক জমিদার। অমি অভিভাবিকা স্বরূপে সে বিশাল জমিদারীর ভার আপন হাতে তুলে নিয়েছে। বিনয় এখন জেলে……সে দেশ-সেবক। ননীর মা পুত্রশোকে কাশীবাসী হয়েছেন।

মানুষ গড়ে, বিধাতা ভাঙে; বিধাতা গড়ে, মানুষ ভাঙে।

দা'ঠাকুরের শিলং-ভ্রমণ

আমাদের 'সানডে ক্লাবের' সভাপতি শ্রীযুক্ত গদাধর সিংহ ওরফে দা'ঠাকুর সশরীরে কলকাতা সহরে বসবাস করছেন এই ত্রিশ বছর। হিসাব-নিকাশ অফিসে কাজকর্ম্ম ক'রে হাড়ভাঙ্গা খাটুনির শ্রান্তি অপনোদনের জন্য সন্ধ্যাবেলা প্রত্যহ তাঁর একবার ক্লাবে আসা চাই-ই। এহেন সিংহ মশায় ক্লাবে অনুপস্থিত থাকলে সেদিনের আমোদই একেবারে মাটি হয়ে যায়।

আজ দা'ঠাকুর ক্লাবে আসতেই সভ্যেরা কোরাস্-স্বরে গান গেয়ে উঠল—

'শিলং পাহাড, শিলং পাহাড়, আসামের তুমি রাজধানী,
মোদের শৈলরাণী গো তুমি—মোদের শৈলরাণী!
কে যাবে ভ্রমণে অবাধ টিকিটে এমন সুযোগ মিলিবে না,
এসো দা'ঠাকুর বাঁধো গাঁঠুরিয়া তা না না······না না না!'

সঙ্গীত থামলে দা'ঠাকুর ব'লে উঠলেন—"ওহে

ব্যাপার কি আজ ? শিলং পাহাড়···শৈলরাণী —এসব কি হে ?”

দিবাকর গম্ভীরমুখে জবাব দিলে—“আনন্দ-বাজারে বেরিয়েছে, এবার শিলংভ্রমণের স্বর্ণ সুযোগ—মাত্র একটি বারের ভাড়ায় শিলং বেড়িয়ে আসা যায়।”

দা’ঠাকুর বিরক্তির সুরে বললেন—“আরে ছ্যা, ছ্যা, শিলংএ কখনও বাঙ্গালী যায় ! যে শীত—বাব্বা !· ওসব সাহেব-সুবোর জায়গা। সেবারে আমার পিসতুত বোনের দেওর হয়ে গিয়েছিল। তার মুখে শুনলাম, কি বিশ্রী জায়গা। বারো ঘণ্টা বৃষ্টি—কাদায় প্যাঁচ্-প্যাঁচ্ ; অসম্ভব শীত, ঠাণ্ডা জল ; চোখের নিমেষে তোমরাও বরফ হয়ে যেতে পার—এমনি অবস্থা সেখানে !”

সকৌতুকে দা’ঠাকুরের মুখ-পানে চেয়ে পরাশর বলল—“সবই বুঝলাম দা’ঠাকুর। পয়সা খরচ করলে হনলুলুতেও আরাম পাওয়া যায়, আর শিলং ত কোন্ ছার ! পয়সা ছাড়া কোন্ কাজ

হয় সংসারে ? বিনি পয়সায় ত শ্যামবাজার থেকে কালীঘাটও যাওয়া যায় না।”

দা’ঠাকুর উত্তেজিত হয়ে বললেন—“আলবৎ যাওয়া যায়। যাওয়া আবার যায় না! ইচ্ছা থাকলে সবই করা যায়। ছোটবেলায় আমরা কখনও গাঁটের পয়সা খরচ ক’রে কালীঘাটে গিয়েছি ? মায়ের কৃপা থাকলে সবই হয়।”

বিরিঞ্চিবাঞ্ছা টেবিল চাপড়িয়ে ব’লে উঠল—“দা’ঠাকুর, তোমার মায়ের কৃপা আমরা হাতে হাতে পরখ ক’রে দেখতে চাই। তুমি এই পূজোর ছুটিতে একটি পয়সাও খরচ না ক’রে শিলং থেকে বেড়িয়ে এস দেখি !”

ব্রজেন জোর দিয়ে বলল—“আমি না হয় মেসো মশায়কে ব’লে শিলং যাওয়া-আসার একখানা রেলওয়ের পাস যোগাড় ক’রে দেব। আর সব ব্যবস্থা এখন তোমার। খাওয়া-দাওয়া, বাজে খরচ সব বিনি পয়সায় করতে হবে।”

তথাপি দা’ঠাকুর নিরুত্তর। বিড়-বিড় ক’রে

গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে মনে মনে ডেবিট-ক্রেডিট আওড়াতে লাগলেন।

দাশু বড়লোকের ছেলে, ফি মাসে ক্লাবে দশ টাকা চাঁদা দেয়, মাথায় একটু ছিটও আছে; সে জোর গলায় বলল—"আমি তা হলে দা'ঠাকুরের হাতে নগদ একশ' টাকা দিতে রাজি আছি—অবিশ্যি শিলং থেকে ফিরে এলে।"

দা'ঠাকুর তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠলেন এবং চিংড়িমাছের মত হাত-পা ছুঁড়ে কীর্ত্তনের সুরে ব'লে উঠলেন—"আমি যাব, আমি যাব সেই দেশে,... দাশু হে, তুমি এখন টাকার যোগাড় করো..."

সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সভ্যেরাও বিকট-স্বরে কোরাস্ গান গেয়ে উঠল। পাড়ার লোকেরা মনে করল, ক্লাবে বুঝি আগুন ধরেছে। দেখতে দেখতে গলির ভিতর অনেক লোক জড় হয়ে গেল। চতুর লোকেরা দাওয়ায় উঠে উঁকি মেরে দেখল, দা'ঠাকুরকে মাঝখানে রেখে জন কয়েক ছেলে-ছোকরা ব্রতচারী নৃত্য সুরু করেছে। কেউ বা

মুখ টিপে হাসল, কেউ বা যাচ্ছে-তাই গালাগালি করতে করতে চ'লে গেল। রাত এগারোটায় আবার পাড়াখানি নিস্তব্ধ হল।

বারো দিনের পূজোর ছুটি। দা'ঠাকুর পরদিন অপরাহ্নে শিলং-ভ্রমণে বেরুবেন। দাশু একশ' টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে বলল—"এই টাকা শিলং থেকে আবার ফিরিয়ে এনে দেখাতে হবে কিন্তু। শুধু বিপদ-আপদের জন্য দেওয়া গেল আপনাকে।"

অন্যান্য সভ্যেরাও যে যেমন পারল, সুট, ভেষ্ট, কোট, প্যাণ্ট, কম্বল, গরম কাপড়-চোপড়ে ব্যাগটি ভ'রে দিল।

শিয়ালদ' ষ্টেশনে সকলেই এসেছিল। দা'ঠাকুরের ইণ্টার ক্লাসের পাস। পায়জামার মত প্যাণ্টেলুন এবং তাকিয়ার খোলের মত একটি কালো কোট প'রে দা'ঠাকুর গাড়ীতে ব'সে সভা গুলজার ক'রে গল্প বলছিলেন। এদিকে শ্যাম-বাজার হতে যে ট্যাক্সিখানা দা'ঠাকুরকে ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়েছিল, তার ড্রাইভার পয়সার আশায়

তখনও ব'সে! দা'ঠাকুর ব'লে গিয়েছেন—টিকিট কিনে টাকা দিয়ে যাবেন। তবে নোট-বুকে ট্যাক্সির নম্বর ৫১৪ সযত্নে লিখে রেখেছিলেন।

পূজোর ভীড়। ট্যাক্সি-চালক আর কতক্ষণ সেখানে ব'সে থাকবে, খানিকক্ষণ পরে সে এসে প্ল্যাটফরমে পই-পই ক'রে প্রত্যেক গাড়ীতে উঁকি মেরে দেখতে লাগল। আসাম মেল কখন চ'লে গেছে, একটি লোকাল ট্রেন ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে। ট্যাক্সি-চালক এদিক-সেদিক ঘুরে ফিরে গাড়ীতে এসে বসল এবং সহজ-সুলভ ভাষায় দা'ঠাকুরের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করল। সবে সে পাঞ্জাব হতে এদেশে এসেছে, এতটা বুঝতে পারে নি যে, একজন কোট-প্যাণ্টপরা সাহেব তাকে ঠকাতে পারে—মাত্র এক টাকা কি দেড় টাকার জন্য।

পোড়াদ' ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছতে গাড়ীখানি লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। লট-বহর, ট্রাঙ্ক-বিছানার ছড়াছড়ি, কেউ বা বিছানার উপর ব'সে আছেন, কেউ দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে বাইরের

দৃশ্য দেখছিলেন। জন দুই মাড়োয়ারী ভদ্রলোক রাশীকৃত জিনিসপত্রের মাঝখানে ডুবে ছিলেন।

এক কোণে ব'সে দা'ঠাকুর বিড়ি খাচ্ছিলেন, এদিকে ক্ষুধারও উদ্রেক হয়েছিল। সেই কোন্ সকালে এক মুঠো ভাত খেয়ে এসেছিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা গড়ের মাঠে হাওয়া খেয়ে ভীম নাগের দোকানে এক থালা সন্দেশ খাওয়ার যে অভ্যাস, তা গাড়ীতে ব'সে অত সহজে ভুলতে পারলেন না। অথচ বন্ধুদের কাছে কথা দিয়ে এসেছেন যে, বিনি পয়সায় শিলং-ভ্রমণ শেষ করতে হবে। কুলী, গাড়ী, জলখাবার এসবের জন্য এক পয়সা খরচও নিষিদ্ধ। কুলীর কাজ না হয় নিজেই করবেন, গাড়ীর জন্যও তত ভাবনা নেই, এখনও অনায়াসে অক্লেশে চৌরঙ্গী হতে কালীঘাটে হেঁটে যাওয়ার অভ্যাস তাঁর আছে; সুতরাং গাড়ী-ঘোড়া বা যানবাহনের জন্য দা'ঠাকুরের বিন্দুমাত্র চিন্তার কারণ নেই। এখন ভোজন-ব্যাপারের কথা ত ভুললে চলবে না। অথচ এক পয়সা খরচ করবার

জো নেই। এই একশ' টাকার গোটা নোটখানা জলজ্যান্ত তাদের হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে। বাড়ী হতে তিনি কি দশ-বিশ টাকা আনতে পারতেন না? কিন্তু বুড়ো মিহির সেন এমন বদ যে, আসবার সময় তাঁর পকেট, কাপড়-চোপড় সব তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে দেখেছে।

শত হলেও দা'ঠাকুর দমবার পাত্র ন'ন। যে-কোন একটা বুদ্ধি দা'ঠাকুরের মাথায় গজাবেই। সেজন্য অফিসেও তাঁর কম প্রতিপত্তি নয়। একটা কিছু ডেবিট-ক্রেডিটের গোলমাল হলেই—'ডাকো সিংহী মশায়কে'। সিংহী মশায় এমন একটা গোঁজামিল দিয়ে ব্যাপারটি সামলে নেন যে, সাহেব পর্য্যন্ত অবাক্ হয়ে যায়।... ...

রাত্রি তখন আটটা বাজে। দা'ঠাকুরের পাশের মাড়োয়ারী ভায়ার একটু ঘুমের আবেশ মাত্র হয়েছিল। কিছুক্ষণ আগে তারই ট্রাঙ্কের পাশে রক্ষিত টিফিন-কেরিয়ারটির দিকে দা'ঠাকুর ঘন ঘন দৃষ্টি হেনেছিলেন। অবসর এবং সুযোগ বুঝে তিনি

ধীরে ধীরে টিফিন-কেরিয়ার থেকে দইবড়া, জিলিপি এবং বুঁদে বার ক'রে নিলেন।

মাড়োয়ারী ভদ্রলোক তখনও 'গভীর নিদ্রায় মগ্ন। এই ভীড়ের মধ্যে অন্যান্য যাত্রীরা তেমন কিছুই টের পেল না, কিন্তু দা'ঠাকুর যখন টপাটপ্

ক'রে দইবড়া সাবাড় করছিলেন, মাড়োয়ারী ভদ্রলোক তখন আড়মুড়ি ভেঙ্গে উঠে বসলেন। দা'ঠাকুর জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে পরমানন্দে ভোজন করতে লাগলেন। খুব সম্ভব মাড়োয়ারী

ভদ্রলোক গন্তব্যস্থানে পৌঁছে এসব ব্যাপার টের পেয়েছিলেন, কারণ দা'ঠাকুর ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি আর কেউ টিফিন-কেরিয়ারের কাছে ছিল না—তা ভদ্রলোকের নিশ্চয়ই মনে থাকবার কথা!

সকালবেলা গাড়ী এসে আমিনগাঁও পৌঁছল। ষ্টীমারে ব্রহ্মপুত্র নদ পারাপার হতে হয় একথা দা'ঠাকুরের জানা ছিল। প্রাতঃকৃত্য শেষ ক'রে তিনি ষ্টীমারের এদিক-ওদিক ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগলেন। অদূরে একদল সাহেব ও মেম প্রাতরাশ ভোজনের উদ্যোগ করছিল। তাঁরও ইচ্ছা হল ওই সাহেবদের কাছাকাছি একটা টেবিলে ব'সে কিছুক্ষণ মনের সাধ মিটিয়ে ফেলেন। হঠাৎ তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। একদিন মোহন-বাগানের খেলা দেখে ফেরবার সময় দা'ঠাকুর কার একখানি লয়েড ব্যাঙ্কের চেক বই কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। সেখানি আজ স্যুটকেস হতে বার ক'রে ফেললেন। আর কি কথা আছে, খানসামাকে খাবার আনতে হুকুম করলেন।

টেবিলে ব'সে তিনি যেমন গোগ্রাসে আহারাদি সম্পন্ন করলেন, তা দেখে, খানসামা, বাবুর্চ্চি, মায় ষ্টীমারের উপরের শ্রেণীর আরোহীদের পর্য্যন্ত তাক লেগে গেল। খানসামা বিল দিয়ে গেল সাড়ে পাঁচ টাকা। তিনি চেক কেটে ছ'টাকা লিখে দিলেন। লয়েড ব্যাঙ্কের চেক দেখে ষ্টীমারের সোরাবজীর ম্যানেজার সাহেব বিশেষ কিছুই সন্দেহ না ক'রে, চেকখানি ক্যাশবাক্সে রেখে দিল।

আমিনগাঁও-এর অপর পারে পাণ্ডুঘাট হতে দু' মাইল দূরে পাহাড়ের উপর কামাখ্যা দেবীর মন্দির। দা'ঠাকুর পথ হতেই দেবীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করলেন। তার একটু পরেই ব্রহ্মপুত্র নদের উপর অবস্থিত আসামের প্রধান সহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র গৌহাটী দেখতে দেখতে চললেন। গৌহাটী হতে শিলং—পার্ব্বত্যপথ, অতি চমৎকার দৃশ্য!

শিলং পৌঁছে দা'ঠাকুর মনে মনে স্থির করলেন যে, এখানে দিন চার-পাঁচেকের বেশী কোন

মতেই থাকা হবে না। কারণ পূজোর ছুটিতে ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকলেও খুলতে কতক্ষণ! শিলংএ হিলটপ হোটেলের ম্যানেজার ফেলু ধরের কাছে দা'ঠাকুর পরিচয়পত্র লিখে দিলেন,—রায়বাহাদুর যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, জমিদার, ভবানীপুর। ভবানীপুর ত আর রশিখানেক জায়গা নয় যে, ভবানীপুরের জমিদার বললে সকলেই সহজে চিনে ফেলবে। ঠিকানা দিলেন—৪৯নং গদাধর সিংহের লেন, কলিকাতা। ভবানীপুরে ঐ নামে কোন গলি আছে কিনা আমরা জানি না। হিলটপের ম্যানেজারবাবু অতিশয় সদাশয় লোক। জমিদারের নাম শুনে তিনি প্রত্যহ তিনবার ক'রে তাঁর খোঁজ-খবর করতেন। দা'ঠাকুরও শেষে তাঁকে একেবারে পেয়ে বসলেন। আর যায় কোথা, শেষে একদিন একশ' টাকার একখানি চেক ম্যানেজারবাবুর কাছ হতে ভাঙ্গিয়ে নিলেন।

শিলঙে দেখবার মত যে সব জায়গা আছে তা ম্যানেজারবাবু দা'ঠাকুরকে না দেখিয়ে ছাড়লেন

না। একদিন নিকটবর্ত্তী চা-বাগানে চা-প্রস্তুত-প্রণালী দেখলেন। আর একদিন সুবিখ্যাত এলিফ্যাণ্ট ফল্‌স্‌ দেখলেন। পাহাড়ের উপর অবস্থিত হলেও এই সহরে ক্রিকেট, গল্‌ফ্‌ প্রভৃতি খেলবার জন্য অতি সুন্দর মাঠ ও বেড়াবার জায়গা আছে। এখানকার বাজার চমৎকার—সাজান-গোছান। বাজারে বেড়াতে গিয়ে একদিন খাসিয়া-নৃত্য দেখে তাঁর কি আনন্দ! শিলংএর প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী এত সুন্দর যে, কেউ কেউ একে ভারতের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান স্বাস্থ্যনিবাস, শৈলরাণী—"Queen of hill-stations" বলেন।

মিঃ ঘোষালের দোকানে দা'ঠাকুর একখানি ফটো তুললেন, ডেয়েরীতে গিয়ে ক্লাবের সভ্যদের জন্য 'শিলং মাখন', 'কমলা সন্দেশ' প্রভৃতি কিনলেন। তারপর একদিন তিনি শ্রীহট্টের পথে কলকাতা রওনা হলেন।

বলা বাহুল্য হিলটপের ম্যানেজারবাবুকেই শুধু তিনি চেকে পরিতৃপ্ত করেন নি—ঘোষালবাবু ও

ডেয়েরীর ম্যানেজারবাবুকেও তিনি চেকে টাকা 'পেমেণ্ট' করেছিলেন। শিলং সহরে জয়জয়কার প'ড়ে গেল। অনাথ বিদ্যালয়, বিদ্যামন্দির, কুকুর-প্রহার-নিবারণী সভা, হরিভক্তি আশ্রম, খাসিয়া ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম কিছুই বাদ গেল না, সকলকেই তিনি দশ-বিশ টাকা দান ক'রে গেলেন!

দা'ঠাকুর কলকাতা পৌঁছবার সময়টা ক্লাবের সভ্যদের জানিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই সকলে দল বেঁধে তাঁকে 'রিসিভ' করবার জন্য শিয়ালদ' ষ্টেশনে উপস্থিত হল।

দা'ঠাকুর প্ল্যাটফরমের বার হতেই তাঁর হাতে, বগলে এবং কুলীর মাথায় রাশি রাশি জিনিসপত্র দেখে ত সভ্যদের চক্ষু স্থির! দাশু লাফিয়ে উঠে বলল—"আমার টাকা?"

দা'ঠাকুর বললেন—"এই নাও তোমার একশ' টাকার নোট!" ব'লে তিনি পকেট হতে নোটের তাড়া বার ক'রে দাশুর হাতে ছুঁড়ে দিলেন।

ভোম্বোল, মিহির সেন, দিবাকর, বিরিঞ্চিবাপ্পা,

জলধি, ভূতনাথদা', তরণী—সকলেই সেই নোটের তাড়া পরীক্ষা ক'রে বললেন—"ব্যাপার কি দা'ঠাকুর ?"

"সে এখন নয়, পরে বলব"—ব'লেই দা'ঠাকুর খাবারের জিনিসগুলো সভ্যদের হাতে সঁপে দিলেন।

ট্যাক্সিতে চেপে সকলেই মহানন্দে দা'ঠাকুরকে নিয়ে বিষম হল্লা করতে করতে চলল। জলধি শিলং পাহাড়ের সেই কোরাস্ গানটা সুরু ক'রে দিল। .. ...

আজ সান্‌ডে ক্লাবে বিরাট ভোজ। একা দাশুই সব ব্যয় বহন করছে। অন্যান্য সভ্যেরা চাঁদা তুলে এবং সেই একশ' টাকা হতে শিয়ালদ'র ৫১৪নং ট্যাক্সিওয়ালার পাওনা মিটাবার এবং শিলঙের বাবুদের টাকাগুলো মনিঅর্ডার যোগে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন—এই কথা বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে। 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' বিস্তৃত বিবরণ বার হচ্ছে—"রায় বাহাদুরের কাছে আপনাদের কারও কিছু পাওনা থাকলে তাঁর অফিসের ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করতে পারেন। টাকা মাঠে মারা যাবে না, এ কথা একেবারে নিশ্চিত; কারণ দা'ঠাকুর সরকারের হিসাব-নিকাশ অফিসের কর্ম্মচারী—ধনী লোক, সহজে লোককে দেনা-পাওনা হতে বঞ্চিত করতে চান না।"

চরকুহকী

মেঘনা নদীর বুকে পাল তুলে একখানি নৌকো তরতর ক'রে ছুটে চলেছে। তখনও নদ-নদীর বিপুল জলরাশি নেমে যায় নি। নৌকো চাঁদপুর ষ্টেশন ছেড়ে বহরের সোজাসুজি পাড়ি ধরেছিল। হেলতে দুলতে নৌকোখানি বড়গাঙে এসে পড়েছে।

দূরে ও কাছে ছোট ছোট ডিঙির অন্ত নেই। ইলিশ মাছের বেপারীরা জাল পেতে মাছ ধরতে ধরতে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। এক ঝাঁক গাঙচিল এদিক ওদিক উড়ে ঝুপ্‌ ক'রে নদীতে ডুব দিয়ে মাছ ধরছিল। মিলু খিল-খিল ক'রে হেসে বলল—"দেখেছ মা, পাখীগুলো কেমন ডুব মেরে কোথা চ'লে যাচ্ছে।"

পানু ধমক দিয়ে বলল—"ধেৎ বোকা, ডুব মেরে আবার কোথায় যাবে রে?"

ঘণ্টা তিনেক নৌকোর ভিতর হাত-পা গুটিয়ে ব'সে দুটি ভাই-বোনে একেবারে বিষম হাঁপিয়ে

উঠেছিল। জীবনে এই প্রথম তারা বাপ-মায়ের সাথে গ্রামে পূজো দেখতে যাচ্ছে।

নৌকোয় দু'জন মাঝি; দাঁড় টেনে গল্প ব'লে, তামাক খেতে খেতে তারা চলেছে। কখন যে ওপারে পৌঁছবে, সেকথা তাদের ভাব-ভঙ্গী দেখে কিছুই মনে হয় না, যেন নিরুদ্দেশ-যাত্রা করেছে।

এত বড় নদী মিলু জীবনে কোনদিন দেখে নি। তারা অন্য নদী দেখেছে বটে, কিন্তু নদীতে এত বড় ঢেউ, আকুল গর্জ্জন এসব দেখা ত তাদের অভ্যাস নেই। মাঝিরা পাটাতনের উপর মাদুর বিছিয়ে দিয়েছিল; তার উপরে ভাই-বোনে মায়ের কাছে শুয়ে কত সব অদ্ভুত প্রশ্ন করছিল। সত্যেনবাবু ছইয়ের উপর ব'সে চারদিকে চেয়ে দেখছিলেন এবং মাঝে মাঝে পুত্র-কন্যাকে দূরের পানে কি একটা নীল রেখার মত গাঁ দেখিয়ে বলছিলেন—"পানু, মিলু, উঠে এস। ওই যে আমাদের দেশ ধূ-ধূ দেখা যাচ্ছে।"

মাণিক মাঝি মৃদু হেসে বলল—"ব্যস্ত হন

কেন ? ওই ত শিমুলবাড়ীর হাট-বাজার, এর পরেই পঞ্চসার ; তারপর হ'ল রতনপুর।"

নদীর তীরে দাঁড়িয়ে নগ্নদেহ কত ছেলেমেয়ে তাদের নৌকো লক্ষ্য ক'রে ঢিল ছুঁড়ছিল। পদ্মার ঘোলাটে জল আর মেঘনার কালো জলে মিশে একাকার হয়েছে। সমুখে একটা চর। সন্ধ্যা হতে তখন একটু বাকি। পানু চরের ছেলেপিলে-দিগকে দেখে মনে মনে খুব হাসতে লাগল এবং ভাবল—'এই বুঝি সব গাঁয়ের ছেলেমেয়ে। ওরা কি দুঃখী,—না দেখেছে রেলের গাড়ী, দোতলা বাস। ...সেলুনে ব'সে চুল কাটা যায়, তেতলায় গরম জল কলের পাইপে ছুটে আসে, লিফ্‌টে ব'সে স্বর্গে উঠা যায়,—সহরের এসব কথা কি তারা জানে ?'

নৌকো চলেছে, মাঝিরাও ব'সে নেই, তবু রতনপুর আর আসেই না। চারদিকে শুধু সবুজ ধানের ক্ষেত—হাওয়ায় ঢেউ খেলছে, আর দুই দিকে কেবল খড়ের ও টিনের ঘর-বাড়ী, ফাঁকা চর এসব দেখে শুনে আর কাঁহাতক চুপ ক'রে থাকা যায় !

এমন সময় একটা প্রকাণ্ড চরের কাছে নৌকো আসতেই মাঝিরা লগি বেয়ে চলল। চরের কাছে জলও খুব বেশী নয় এবং ঢেউ একেবারে নেই বললেই চলে।

মাণিক মাঝি চুপি চুপি বলল—"আজ্ঞে বাবু, এই যে চর দেখছেন না, বড় খারাপ জায়গা; লোকে দিনের বেলা আসতেই ভয় পায়…কুহকীর চর…"

সত্যেনবাবু ধমক দিয়ে উঠলেন—"তবে এলে কেন, ছেলেপুলে নিয়ে?"

"আজ্ঞে আমরা আছি, কোন ভয় করবেন না।"—ব'লেই মাণিক মাঝি নিশ্চিন্তমনে গলুই-এর উপর ব'সে তামাক টানতে লাগল।

মিলু এতক্ষণ চুপ হয়ে শুয়েছিল মায়ের কথায়। মা বলেছেন, তাদের দেশে প্রকাণ্ড দীঘি আছে, দীঘিতে বড় বড় রুই-কাতলা মাছ,…গোটা দুই শেফালি ফুলের গাছ, ফুল তুলে তারা কত মালা গাঁথবে, পানুকে তারা ফুলের গাছ কখনও দেখতে দেবে না। পাড়ার মেয়েদের সাথে তার কত ভাব

হবে। সে তাদের কত লজেঞ্জুস দেবে; পানুকে যে না দেবে, এমন নয়, তবে খুব বেশী সে পাবে না।

ঘোর অন্ধকার রাত্রি। দূরে একটা আলো চরের উপর মিটিমিটি জ্বলছে—ষ্টীমারকে পথ দেখাবার জন্য। আর বড় কিছু একটা দেখা যায় না। পানু মাঝিকে ডেকে বলল—"চর কোথায় গেল মাঝি, একটু জোরে দাঁড় টান না।"

মাঝি হেসে বলল—"এই ত এসে পড়লাম।"

পানুর আর সহ্য হচ্ছিল না। সে এইমাত্র বাবার কাছে শুনেছে, পদ্মা-মেঘনার চরে ডাকাত থাকে, এত অবেলায় তাদের রওনা হওয়া সঙ্গত হয় নি। কেষ্টকুমার যে তাদের বাড়ীতে প্রতিমা গড়ে, ঠিক সেই অসুরের মতই নাকি ডাকাতদের এক-একটির চেহারা!

মাণিক মাঝি জোরে বৈঠা টেনে ভাটিয়ালী সুরে গান ধরেছিল—

"বাবুর বাড়ী পূজোর রোশনাই
বাজেরে ভাই ঢাকাই বাজনা..."

সত্যেনবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন—"আর কতক্ষণ লাগবে মাঝি ?"

—"এই ত এসে পড়েছি। ঘণ্টাখানেক বড় জোর।"

মিলু চোখ দুটি কপালে ঠেকিয়ে ব'লে উঠল —"কি ডাহা মিথ্যা কথা বলছে বাবা! এই বললে আর কতটুকু বাকী, এসেই ত পড়েছি। ধমক দাও না বাবা!"

পানু রাগে চোখ কট্‌মট্ ক'রে বলল—"শেষে যদি ওরা হাত গুটিয়ে ব'সে থাকে,…সবটাতেই তোর বড় বড় কথা!"

—"হাত গুটিয়ে ব'সে থাকবে না হাতী, খেলা পেয়েছে আর কি!"

এমন সময় চরের উপর জনকয়েক লোক ঘোর অন্ধকারের ভিতর অট্টহাস্য ক'রে উঠল।

মাঝিরা মনে মনে আঁতকে উঠে চুপি চুপি বলল—"ডাকাত!—বাবু, আজ আর রক্ষা নেই। কারা যেন চুপি চুপি হাসছে!"

সত্যেনবাবু ছইয়ের বাইরে এসে চারদিকে ভাল ক'রে দেখলেন। আকাশ-বাতাস ধ্বনিত ক'রে এবার গুরুগম্ভীর কণ্ঠে স্বর উঠল—"হর হর—বম্ বম্ !"

মাঝিরা সমূহ বিপদ ভেবে মাঝগাঙে পাড়ি দিল। ডাকাতেরা হো-হো ক'রে হেসে উঠল, বলল—"ফেরাও নৌকো।"

সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের কয়েকটা ফাঁকা আওয়াজ শূন্যে মিলিয়ে গেল। মাঝিরা তবুও প্রাণপণে বৈঠা বেয়ে চলেছিল; হঠাৎ দেখা গেল একদল লোক-বোঝাই একখানি ডিঙি তীরের মত ছুটে তাদের নৌকো আটক করল। আধবুড়ো গোছের একজন লোক মাণিক মাঝির মাথায় বেমালুম কয়েক ঘা লাঠির আঘাত ক'রে বলল—"বেইমান, ডাক শুনতে পাস্ নি বুঝি ?"

সত্যেনবাবু চিত্রাপিতের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। ডাকাত-সর্দ্দার করযোড়ে সেলাম ক'রে বলল—"আমরা টাকা-পয়সা চাই না বাবু, একটি ছেলে কি মেয়ে চাই। নদীর বুকে পুল বাঁধা যাচ্ছে না; মা

নরবলি চেয়েছেন, তাই দিন—একটি। আপনার তো দুটি দেখতে পাচ্ছি।”

শুনে আর্ত্তকণ্ঠে মিলুর মা চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠলেন—“তোমাদের টাকা-পয়সা, গয়না—যা খুশী হয় নিয়ে যাও। আমার দুধের বাছাদের……”

সত্যেনবাবু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে ছেলেমেয়ে দুটিকে আড়াল ক'রে রেখে বললেন—“ককৃখনো দেব না।”

ডাকাত-সর্দ্দার এক লাফে নৌকোর কিনারে পা দিয়ে বলল—“নিধিরাম, দাঁড়িয়ে কি দেখছিস্? কাজ সাবাড় কর।”

মিলু মায়ের কোলে মাথা গুঁজে বসেছিল, ডাকাতের কথা শুনে সে একেবারে ভয়ে এতটুকু হয়ে গেছে! পানুও চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছিল। ডাকাতেরা অন্ধকারে ছইয়ের ভিতর ঢুকে জবরদস্তি সুরু করতেই মাঝিরা নদীতে লাফিয়ে পড়ল।

সত্যেনবাবুকে একজন ডাকাত জোর ক'রে হাত-পা বেঁধে রেখে, অপর একজন সঙ্গী পাঁজা-

টো-টো কোম্পানীর ম্যানেজার',

কোলে ক'রে মিলুকে নিয়ে তাদের নৌকোয় উঠল

সুমুখে হাতড়ে তারা যাকে কাছে পেয়েছে, তাকে নিয়েই নৌকো ছেড়ে দিল। অনুনয়-বিনয়,

কাকুতি-মিনতি কিছুতেই কিছু হল না। অন্ধকার বিদীর্ণ ক'রে মিলুর আর্ত্তনাদ কুহকীর চরে আছাড়ি বিছাড়ি খাচ্ছিল।

জননী মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়েছিলেন, সত্যেনবাবু ও পানুর চীৎকারের মাঝখানে ডাকাতেরা যে কোন্ পথে চোখের নিমিষে উধাও হয়ে গেল, কেউ তা দেখলও না।

নরবলির কথা মনে ক'রে সত্যেনবাবুর অন্তরাত্মা বারংবার কেঁপে উঠছিল। একবার তিনি ভাবলেন —যদি আজ রাত্রিতেই সব শেষ হয়ে যায়। না, না—তা হবে না!

তিনি এই ঘোর বিপদে প'ড়েও সাহসে বুক বাঁধলেন; মনে মনে ঠিক করলেন, পরদিন ভোরে পুলিশের সাহায্যে কুহকীর চর উজাড় ক'রে ফেলবেন। ... ...

পথে এসে দেশলাই জ্বেলে ডাকাতেরা দেখল, ছেলেটির পরিবর্ত্তে মেয়েটিকেই তারা নিয়ে এসেছে। যাক্, নরবলি যখন, স্ত্রী-পুরুষে কোন প্রভেদ নেই

ভেবে ডাকাত-সর্দ্দার মনে মনে আত্ম-প্রসাদ লাভ করল।

দশ বছরের মিনু—ঘাবড়াবার মেয়ে নয় সে। প্রথমে সে খুব ভয় পেয়েছিল, এখন বিপদে বুক বেঁধে মনে মনে নানা কথা ভাবছিল। ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে গিয়ে, মা'র কথা মনে পড়তেই সে মুখে কাপড় গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল; কিন্তু ডাকাত-সর্দ্দারের রক্তচক্ষু দেখে তার আর কাঁদতে সাহস হ'ল না। তার মনে হতে লাগল, —তার বাবা, মা, দাদা, সবাই এখন দেশে গিয়ে পৌঁছেছে। বাড়ীভরা লোক গম্‌গম্‌ করছে। সবাই ছুটে এল, কে কে এসেছে দেখতে। তাকে দেখতে না পেয়ে সবাই হায় হায় করছে।

এখন ত ভোর হয়েছে, ষষ্ঠির বাজনা বেজে উঠতেই পাড়ার যত ছেলেমেয়ে এসে জুটেছে। সবারই পরণে নূতন কাপড়, জামা জুতো। ও আবার কে দাঁড়িয়ে আছে একা—ঘোষালদের বুলো বুঝি? গেল বছর বেচারীর ছোট বোনটি

মারা গেছে, তাই আর নূতন জামা-কাপড় প'রে আসে নি। ... ...

ডাকাত-সর্দ্দার রতন তার রক্তচক্ষু ঘুরিয়ে এক-একবার মিলুর দিকে কটমট ক'রে চাইছিল এবং মাঝে মাঝে—"কাঁদলে মেরে ফেলব" ব'লে ভয় দেখিয়ে শাসিয়ে উঠছিল।

বুড়ো ডাকাত ছমির রতনের দিকে ফিরে ধমক দিয়ে বলল—"চুপ কর রতন। দুধের বাছাকে মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এলি! কাঁদবে না!—বলিস্ কিরে?"

রতন হুঙ্কার দিয়ে উঠল—"তোর কলিজা থাকতে পারে, আমার কলিজা নেই। মনে নেই বুঝি তোর, সেবার পুলিশ দারোগা আমার ছেলেটার বুকে লাথি মেরে পিলে ফাটিয়ে মেরে ফেললে, বাপ-মায়ের চোখের উপর। আমি অন্ধ হই নি শোকে, ছমির। বাল্যের সেই স্নিগ্ধ, শান্ত, প্রশান্ত রতনলাল আজ দস্যু, ডাকাত! বুড়ো হয়েছিস্ কিনা, তাই বুকভরা মায়া। অত মায়া বুকে থাকলে ডাকাতি

করা চলে না। ফিরে যা দেশে, ক্ষেত-খামার ক'রে খাগে।"

ছমির ক্ষুদ্র একটি নিঃশ্বাস ফেলে বলল—"সেও মহাজনের দেনার দায়ে গিয়েছে, কি আছে বল। বুদ্ধি গেছে, বল-ভরসা গেছে; মায়া নেই, দয়া নেই, কি হয়েছি বল দেখি?"

—"ঘাঁটাস্ নে আমায় ছমির, এখনি বুক ভেঙ্গে যাবে।"

ছমির মিলুর দিকে তাকিয়ে বলল—"খুকী, ক্ষিধে পেয়েছে তোমার?"

—"না, তা পাবে কেন? নিজেরা ইলিশ মাছের ঝোল দিয়ে এক থালা ভাত মেখে খেলে, তাতেই আমার পেট ভরেছে!"

ছমির হেসে বলল—"ভাত খাবে?"

—"তোমাদের হাতে কেন খাব?"

—"তবে কি খাবে?"

—"মুড়ি, মোয়া, সন্দেশ।"

রতন হেসে বলল—"মেয়ের আবদার শোন!"

ছমির রাগত ভাবে বলল—"চুপ কর রতন। মেয়েটাকে আর জ্বালাস্‌নে, দুদিন বাদে ত চ'লেই যাবে, দুটো মিষ্টি কথা বলতে ক্ষতি কি রে?"

মিলু ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ ক'রে চেয়ে বলল—"কোথা যাব, আমাকে বাড়ী দিয়ে আসবে বুঝি! জান, কাল থেকে আমাদের পূজো আরম্ভ হবে। আমি বুঝি এবার পূজো দেখব না?"

ছমিরের গায়ে কাঁটা দিয়ে গেল, বলল—"তা দেখবে বই কি! তুমি কালীপূজো দেখবে।"

—"ধেৎ, দুর্গাপূজো না দেখেই কালীপূজো দেখব বুঝি! তুমি কখনও পূজো দেখেছ?"

—"দেখেছি বই কি!"

—"তোমার ছেলেমেয়ে নেই? তাদের সাথে আমি খেলা করব, কেমন?"

ছমির কোন জবাব দিল না, স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল।

ধীরে ধীরে নৌকোখানি তীরে এসে পৌঁছতেই

ডাকাতের দল একে একে ডাঙায় উঠে গেল, বাকী রইল রতন আর মাঝি। নিকটে বাজার ছিল, ছমির সেখান থেকে কিছু ফল-মূল, মিষ্টি এনে মিলুকে দিল।

মিলু খেতে ব'সে মায়ের কথা মনে পড়ায় কাঁদতে লাগল। ছমির কত রকমে সান্ত্বনা দিয়ে তাকে খাওয়াতে লাগল।

আবার সাঁ-সাঁ ক'রে নৌকো চলেছে। মিলু কেঁদে কেঁদে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল, তা টের পায় নি। ঘুম ভাঙ্গতেই চেয়ে দেখে সুমুখে একটা প্রকাণ্ড চর, ধূ-ধূ সাদা বালিতে একেবারে ভর্ত্তি! আকাশ সবেমাত্র ফর্সা হয়ে উঠেছে। নদীতে কোন নৌকো কিংবা ষ্টীমার দেখা যায় না, কেবল থই-থই জল বাতাসে নাচছে, হাসছে। মিলু একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল। এমন সময় মাঝি তাদের ঐ চরে পৌঁছে দিয়ে একটা ফাঁড়ি-পথে সহসা অদৃশ্য হয়ে গেল।

তীরে উঠেই ছমির ভীষণভাবে রাগারাগি সুরু

ক'রে দিল। বোধ করি সারারাতই তাদের এমনি ধরণের কথাবার্ত্তা চ'লে থাকবে।

রতন বলল—"সে কিছুতেই হবে না। আমার হুকুম তামিল করতেই হবে।"

ছমির বাবরি চুলের গোছা নাড়া দিয়ে বলল—"সে হবে না রে, রতন! আমি পারব না। আমি থাকতে মেয়েটাকে..."

"আলবাৎ পারতে হবে,"—ব'লেই রতন চোখ রাঙ্গা ক'রে হুঙ্কার দিয়ে উঠল।

ছমিরও হটবার পাত্র নয়, রোষ-কষায়িত নয়নে চেয়ে রতনকে আক্রমণ করল। তারপর হাতাহাতি, রেষারেষি হতে আরম্ভ ক'রে শেষ পর্য্যন্ত মল্লযুদ্ধ সুরু হল!

মিলু এ-সব দেখে শুনে ত একেবারে অবাক্! সে সতৃষ্ণ-ব্যাকুলদৃষ্টিতে দূরে মসীরেখার মত গাঁয়ের পানে চেয়ে, একান্ত অধীর হয়ে উঠল। কিন্তু চারদিকে নদী, কোথাও এক পা যাবার উপায় নেই। দূরে কত নৌকো পাল তুলে চলেছে, এ চরের

কাছাকাছি একটিও আসছে না। ষ্টীমারের ধোঁয়া যেখানে দেখা যাচ্ছে, সেখানে যেতে হলে অন্ততঃ একঘণ্টার পথ হেঁটে গেলে হয়ত দেখা পাওয়া যেতে পারে।

মিলু পায়চারি করতে করতে একটা আড়কাটির কাছে গেল। আড়কাটির উপরে একটা বাতি ঝুলানো আছে, জাহাজ চরে এসে যাতে ঠেকে না যায়, তারই জন্য এ ব্যবস্থা!

মিলু যেমন আড়কাটির কাছে গিয়েছে, অমনি দেখতে পেল, প্রকাণ্ড একটা কুমীর বোধ হয় দশ-বারো হাতের কম হবে না, চরের বালির উপর দেহ এলিয়ে রোদের তাতে পুড়ে ঘুমুচ্ছে। মিলুর চোখ-মুখ শুকিয়ে গেল, সে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থেকে দূরের পানে যে দৃশ্য দেখতে পেল, তাতে তার অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত কেঁপে উঠল। বোধ করি মিলুর সাড়া পেয়েই কুমীরটা জেগে উঠেছে।

এদিকে রতন ও ছমিরের লড়াই পূর্ণোদ্যমে চলেছে; আজ বুঝি তারা কেউ কাউকে শেষ না

ক'রে ছাড়বে না! মিলুর জন্য তাদের কোন চিন্তা নেই; সে এই নদী-বেষ্টিত চর হতে কোথাও যে পালিয়ে যেতে পারে, এ তাদের ধারণার অতীত।

ঐ—ঐ যে কুমীরটা জেগে উঠেছে! সত্যিই তো সে মিলুর দিকে ছুটে আসছে, আর ত উপায় নেই! মিলু মরীয়া হয়ে উঠে একবার ভাবল রতনের কাছে ছুটে যায়, কিন্তু সেখানে গেলেও আর প্রাণরক্ষা হবে না। সে ছোটবেলায় বাপ-মায়ের কাছে কত কুমীরের গল্প শুনেছে। পদ্মা-মেঘনার কুমীরেরা তীর হতে কত মানুষ, গরু, ছাগল, পাঠা টেনে নিয়ে গিয়েছে, তার অন্ত নেই!

মিলু ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট দিল। হঠাৎ তার মাথায় এক বুদ্ধি খেলল। সে ভাবল, ডাকাতের কাছে ছুটে গিয়ে লাভ কি, তারা তো আজ রাতেই তাকে সাবাড় ক'রে ফেলবে। এদিকে কুমীরটা দস্তুরমত তার পিছনে ধাওয়া করেছে, বাঁচবার একটুকু আশা নেই। গত রাত্রির

অনাহারের ক্লান্তিতে তার সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হয়ে আসছিল ; সে আর সাত-পাঁচ না ভেবে আড়কাটির প্রকাণ্ড বাঁশটায় কোনমতে তর্‌তর্‌ ক'রে উঠে একেবারে মাথায় গিয়ে বসল। তার হাত-পা এবং বুকের খানিকটা উঠবার সময় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে, রাঙ্গা শাড়ীখানি রক্তে ভ'রে উঠেছে, সে কোনমতে উপরে উঠে বিষম হাঁফাচ্ছিল। এমন সময় শূন্যচর ভ'রে ছমিরের মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদ দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, রতন টুঁটি টিপে ধ'রে তখন ছমিরের বুকের উপর বসেছে।

বেলা ক্রমশঃ বেড়ে উঠতেই সমস্ত চরে যেন আগুনের লক্‌লকে শিখার মত কি জ্বলে উঠছে! মিলু আড়কাটির ডগায় ব'সে তাই দেখতে দেখতে নিজেকে আরও বলশালী মনে করতে লাগল। এখন সে ইচ্ছা করলে পদ্মা-মেঘনা তো দূরের কথা, প্রশান্ত মহাসাগর সাঁত্‌রে পার হতে পারে!

রতন ছমিরকে ঠাণ্ডা ক'রে রেখে পিছন ফিরে চাইতেই দেখতে পেল, একটা প্রকাণ্ড কুমীর তার

দিকে বিরাট হা ক'রে আসছে! দাঁত কড়্মড়্ ক'রে রতন এক পা, দু'পা ক'রে ছুট্ দিল, কিন্তু প্রাণপণে দৌড়াবার মত শক্তি তার কোথায়! একে কুমীরটা তার মুখের গ্রাস হারিয়ে আসছে, তার উপর সম্মুখে জলজ্যান্ত আর একটা মানুষ দেখতে পেয়েছে, আর কি কথা আছে—সে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে রতনকে ধর-ধর অবস্থা ক'রে তুলল।

মিলু অপলকদৃষ্টিতে চেয়ে তাই দেখছিল, নেমে আসবার মত তার সাহস, বলবুদ্ধি আর ছিল না।

রতন শেষে আর ছুটতে না পেরে কুমীরের চোখে মুখে বালি ছুঁড়ে মারতে লাগল; তাতে কি আর কুমীরের রাগ পড়ে, কি ভয়ে সে নদীতে ঝুপ ক'রে ডুব মারবে? আর বুঝি পারা গেল না, রতন দু'হাতে কপালে আঘাত করতে করতে পাগলের মত ছুটোছুটি সুরু ক'রে দিল।

মিলু ফ্যাল্-ফ্যাল্ চোখে তাই দেখে শিউরে

রতন এক পা দু'পা ক'রে ছুট্ দিল

উঠছিল। দেখতে দেখতে—চোখের নিমিষে কুমীরটা রতনকে ধ'রে ফেলল এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে বিজয়গর্ব্বে জলে লাফিয়ে পড়ল।

মিলু দুই হাতে চোখ-মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। শত হলেও ত মানুষের মন।

কতক্ষণ এইভাবে কেটেছিল ঠিক মনে নেই, হঠাৎ ষ্টীমারের ঝক্-ঝক্ ঢেউয়ের শব্দে সে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল এবং ক্রমাগত লাল শাড়ীটার আঁচল উড়িয়ে ষ্টীমারের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করতে লাগল।

ষ্টীমারখানি বেগে ছুটে চলেছে। দূর হতে মিলু দেখতে পেল ষ্টীমারে যেন লোক আর ধরে না। পূজোর ভীড়,—লোকে লোকারণ্য। সে প্রাণপণে রাঙ্গা আঁচলটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাতে লাগল। তার মন-প্রাণও অনন্ত আশায় দুলে উঠল।

ষ্টীমারের গতি ক্রমশঃ হ্রাস হয়ে আসল। বার কয়েক ভোঁ-ভোঁ ক'রে সঙ্কেতধ্বনি করতে করতে দু'ধারে ফেনার ঢেউ খেলে গেল; ষ্টীমারখানি সহসা

ঘর্-ঘর্ ক'রে চরের কিনারে নোঙ্গর ফেলে দিল। আরোহীরা নৌকোডুবির যাত্রী ভেবে ছুটে এল। সারেঙ এল—খালাসীরা এল; তারপর তারা ধরাধরি ক'রে ফুট্‌ফুটে মেয়েটিকে ষ্টীমারে তুলে নিল। মেয়েটির কাছ হতে তার বিপদের কথা শুনে, সকলে চরকুহকীর দিকে বিস্ময়দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

সারেঙ বলল—"এই ডাকাতের চরে এমনি কত নিরীহ মানুষ যে প্রাণ বলি দিয়েছে, কে জানে!"

... ...

জনৈক ভদ্রলোক মিলুকে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল।

মিলুর চীৎকার শুনে বাড়ীশুদ্ধ লোক ছুটে এল। সত্যেনবাবু আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করতে লাগলেন। মা ছুটে এসে স্নেহের ধনকে বুকে নিয়ে চুমো খেতে খেতে ব'সে পড়লেন।

সারাগ্রামে হৈ-চৈ প'ড়ে গেল। জগাই ঢুলী উৎসবের সমারোহের মাঝে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে

গ্রামখানি মাথায় ক'রে তুলল। আনন্দের আতিশয্যে পাড়ার ছেলেমেয়েরা তাক্-ধিন্-ধিন্—তাক্-ধিন্-ধিন্ ক'রে পূজোর আঙিনায় নাচতে লাগল। হরে ঠাকুরদা' দু'হাতে তালি দিয়ে মাথা নেড়ে গান ধরলেন—

"মা এসেছে, মা এসেছে, মা এসেছে রে!"

পচা ঘোষাল

পচা ঘোষালকে জানো ?

জগতে টাকা-পয়সা না থাকলেও রাজার হালে থাকা যায়, এ কথা যার কাছে প্রথম শুনেছিলাম, তার নাম হচ্ছে পচা ঘোষাল। সত্যি তাই। এমন বেপরোয়া লোক—ভারতবর্ষে কেন, পৃথিবীতে বিরল। সংসারের কোন ধার ধারে না সে, আজ খেলে কাল কি খাবে এর যার ভাবনা নেই, তার মত সুখী জগতে কে ?

জীবনটাকে সে হাতে নিয়ে বেড়ায়। কত দেশ-বিদেশ সে ঘুরে এসেছে, কত লোকজনের সাথে তার জানা-শোনা, কত গাল-গল্প সে করতে জানে, এমন হাস্য-রসিক একটি বিরাট পুরুষ বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কোথাও সহজে মেলা ভার,—পাড়ার হারু ঠাকুর্দ্দা রসিকতা ক'রে ব'লে থাকেন।

চাকরি-বাকরির বালাই নেই। কি চাকরি

সে করবে? ম্যাট্রিকও পাশ করতে পারে নি, তবে জগতের খবর অনেক রাখে সে। হিটলার প্রতিদিন কি আহার করেন, আমেরিকার কারখানায় ক'খানি জঙ্গীবিমান তৈরি হচ্ছে, মানুষের মস্তিষ্কে কতগুলো শিরা-উপশিরা আছে, তিমি মাছ রাত্রিবেলা কোথায় লুকিয়ে থাকে—দুনিয়ার যত আজগুবি খবর ঘোষাল জানে। গ্রামে যাই, দেখি ঘোষাল সেখানে। দার্জ্জিলিঙ যাই, সেখানে দেখি ঘোষাল আসর জমিয়ে আছে। জামসেদপুর প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনে গিয়ে দেখি, ঘোষাল রঙ্গপুর থেকে প্রতিনিধি হয়ে এসেছে! আবার ঢাকার দাঙ্গায়, ভোলার ঝটিকা-পীড়িত আর্ত্তদের সাহায্য-কল্পে কোমর বেঁধে ঘোষাল দেশে দেশে চাঁদার খাতা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে! শুধু তাই নয়, কলকাতায় রবীন্দ্র-স্মৃতি-বাসরে ঘোষাল "দেশ দেশ নন্দিত করি"—কোরাস্ গানের তরুণ-তরুণীদের দলে ভিড়ে গেছে এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভা সম্বন্ধে লম্বাচৌড়া বক্তৃতা দিচ্ছে।

পোষাকটি কিন্তু তার অদ্ভুত ধরণের, কখনও হিন্দু, কখনও মুসলমান, কখনও মারাঠি, গুজরাটি, উড়িয়া, মেড়ো—নয় কোন্ জাতের তাই খুঁজে পাই নি। সময় সময় দেখি, ফিট সাহেব সেজে ঘোষাল ইংরেজিতে সুরেন্দ্রনাথের মত বুলি আওড়াচ্ছে এবং যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় ভারতবাসীকে সাহায্য করবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছে।

কি ক'রে ঘোষালের দিন গুজরান হয় এই নিয়ে অনেক দিন মাথা ঘামিয়ে দেখেছি, কোন সুরাহা করতে পারি নি। একবার তার সাথে দেখা পূজোর ছুটিতে। সে দেশে যাচ্ছিল, আমাদেরই এক গাড়ীতে। আমরা সবাই সটান দাঁড়িয়ে যাচ্ছি, সে গিয়ে কলেজের ছেলেদের সাথে ভিড়ে পড়েছে। শেষে দেখলাম, ছেলেরা তাকে চা, পান, বিড়ি, সিগারেটে আপ্যায়ন করছে।

ঘোষাল কি কম পাত্র, টিকিট না কেটেই দেশে যাচ্ছে। ছেলের দল তাকে ঘিরে বসেছে। সে তার আফ্রিকা অভিযানের গল্প বলছে, এমন কি মহাত্মা

গান্ধীর সাথে তার সেখানে যে দেখা হয়েছিল, এ কথাও বলতে ভোলে নি। বয়সের তার হদিস পাওয়া কঠিন। ছেলেদের আসরে ত্রিশ-বত্রিশ, আর বুড়োদের কাছে পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স সে ব'লে ফেলে। হঠাৎ টিকিট-চেকার এসে উপস্থিত। ঘোষালের কাছে টিকিট চাইতেই সে ফস্ ক'রে ব'লে দিলে—"ইঞ্জিনের কাছে যে ইণ্টারটা আছে না, সেখানে 'ফণের' কাছে আছে, চেয়ে দেখে নেবেন, স্যার! ভুলবেন না যেন।"

টিকিট-চেকার স্মিতমুখে বললে—"ধন্যবাদ!" ব'লেই তিনি সিগারেট ধরিয়ে ঘোষালের পাশে ব'সে পড়লেন। ঘোষালের সে কি হৃদ্যতা, ভদ্রলোক আতিথ্যের আতিশয্যে, গল্পে গুজবে একেবারে জল হয়ে গেলেন। কোথায় গেল টিকিট দেখা আর কোথায় কি! গোয়ালন্দ অবধি এক সাথে গল্প ক'রে চ'লে এলেন।

আর একবার দেখা কামাখ্যা তীর্থধামে। দেখি ঘোষাল মস্ত ফোঁটা তিলক কেটে "মা লক্ষ্মীরা,

গরীব ব্রাহ্মণকে •একটি পয়সা দিয়ে যান” ব'লে, করুণদৃষ্টিতে চেয়ে মন্দিরের সুমুখে দাঁড়িয়ে আছে !

অম্বুবাচীর সময় যে ভীড়, দেখলাম ঘোষাল কমপক্ষেও এই তিন দিনে গোটা কুড়ি টাকা উপার্জ্জন করেছে এবং আমি যে তাকে জানি, একথা সে হাবভাবে সেখানে কোন দিন কারও কাছে প্রকাশ করে নি। আমি ত দেখে হতভম্ব !

পরদিন ভোরে দেখি ঘোষাল হৃষ্টচিত্তে একদল যাত্রী নিয়ে (অবিশ্যি তারা স্ত্রীলোক) কলকাতা রওনা হয়েছে। তাঁদের সাথী নাকি হারিয়ে গেছে, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ! জোর বরাত বটে !

সেবার গঙ্গাস্নান উপলক্ষে পিসীমাকে নিয়ে কলকাতায় গিয়েছিলাম। পিসীমার দেওরের বাসায় আমরা উঠেছি। সকালবেলা দেখি, এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কন্যাদায়ে বিষম বিব্রত হয়ে পিসীমার দেওর হাইকোর্টের এডভোকেট সতীশবাবুর কাছে এসে হাজির। আমি পাশের ঘরে ব'সে সতীশবাবুর ছেলে নন্তুর সাথে কথাবার্ত্তা বলছি। সে কি

ব্রাহ্মণের কান্না! সতীশবাবু দয়াপরবশ হয়ে ছুটি টাকা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের হাতে দিলেন।

কণ্ঠস্বর শুনে মনে একটু খট্‌কা লাগল। বাইরে এসে দেখি, ঘোষাল হন্‌হন্‌ ক'রে ফুটপাত ধ'রে চ'লে যাচ্ছে। পিছু পিছু গিয়ে তাকে পাকড়াও করলাম। ঘোষাল হেসে বললে—"কিরে মণ্টু, কবে এলি এখানে? কোথা যাচ্ছিস্?"

হেসে বললাম—"তা' হলে চিনতে পেরেছ এবার, এ-ই ভাগ্যি!"

ঘোষাল হেসে বললে—"তা আর চিনব না! কেমন আছিস্ বল্।"

অনেক কথা হল। রাসবিহারী এভিনিউ ধ'রে অনেকটা দূরে এসে পড়েছিলাম। পথের ধারে একটা হল্‌দে রঙের বাড়ী দেখিয়ে ঘোষাল বললে—"এই আমার মাসীমার বাড়ী।" খানিকটা দূরে গিয়ে বললে—"এই পিসীমার বাড়ীর পথ,—পণ্ডিতিয়া রোড।"

তারপর কাকীমা, বৌদি, দিদি—ছুনিয়ার যত

আত্মীয়াদের নাম করতে করতে ঘোষাল পথ চললে, যেন সারা বালীগঞ্জটাই ঘোষালের মুঠোর ভিতর।

আমার ফস্ ক'রে মনে প'ড়ে গেল, ঘোষালের ত তিন কুলে কেউ নেই, এত আত্মীয়-স্বজন এল কোথা থেকে! বললাম—"তোমার আবার মাসীমা কে ছিলেন?"

ঘোষাল গম্ভীরভাবে জবাব দিলে—"সব ভুলে গিয়েছ তোমরা,···সেই যে রাঙা মাসীমা! চল্ একটু পা চালিয়ে নে, রাঙা মাসীমার ওখান থেকে একটু ঘুরে আসি।"

প্রায় মাইল খানেক পথ চ'লে ঘোষাল একটা পথের ধারের বাড়ীতে ঝুপ ক'রে ঢুকে প'ড়ে আমাকে বাইরের ঘরে বসিয়ে রাখলে। আমি ভাবলাম, নিশ্চয়ই ঘোষালের চেনা-জানা লোক বা আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী।

দারোয়ান আমাকে বললে—"আপনারা কোত্থেকে আসছেন?"

বললাম—"ঘোষাল বাবুর সাথে এসেছি।"

দারোয়ান কিছুই বুঝতে না পেরে বললে—“বাবু বুঝি ভিতরে গেছেন ? মা-লোক খালি আছে বাড়ীতে, ‘বাবু’ এলাহাবাদে গেছেন।”

একটুখানি পরে এক ভদ্রমহিলা কাঁদ-কাঁদ ভাবে ছুটে এসে বললেন—“খোকা কেমন আছে ? আপনাদের ওখানে কি ক’রে গেল ? থাক্, তবু শুনে নিশ্চিন্ত হয়েছি।”

ঘোষাল প্রায় সাথে সাথেই ব’লে উঠল—“কত সাধ্য-সাধনা ক’রে আমরা ধ’রে রেখেছি। এর বড়দা’র কাছে রেখে এসেছি কত বুঝিয়ে-সুঝিয়ে। এর বাবা ঢাকার জজ, খুব বড়লোকের ছেলে। আমার আবার একটু দূর-আত্মীয়।” আমি ব্যাপারের আগাগোড়া কিছুই বুঝতে না পেরে থতমত খেয়ে গেলাম।

হঠাৎ ভদ্রমহিলা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—“কেমন আছে খোকা ?” ঘোষাল তাড়াতাড়ি চোখ ইসারায় আমাকে মাথা নেড়ে জানাতে বললে, ‘ভালো !’ প্রাণভয়ে কোন মতে বললাম—“ভালো !”

মাথা থেকে পা অবধি সব অবসন্ন হয়ে আসছিল। যেন বুক ধড়ফড় করছে।

শেষে কোন্ ফ্যাসাদে পড়ব কে জানে, পুলিশের হাতে না পড়ি।...ভদ্রমহিলা ঘোষালের দিকে চেয়ে

বললে—“আপনাদের ঋণ এ জীবনে আমরা শোধ করতে পারব না।”

ঘোষাল বাধা দিয়ে বললে—“ছেলেটি কেন নিরুদ্দেশ হয়েছিল ? রাগ ক’রে পালিয়েছে নাকি ?”

ভদ্রমহিলা বললেন—“না, সে রকম কিছু হয় নি। পরীক্ষায় পাশ করতে পারে নি, তাই ভয়ে পালিয়ে গেছে। আজ তিন মাস কোন খোঁজ-খবর নেই, একটি মাত্র ছেলে আমাদের। পাশ করতে না পেরেছে, তাতে কি হয়েছে! আর একবার চেষ্টা ক’রে দেখো, সেজন্য পালিয়ে যাবার কি হয়েছে!”

ঘোষাল মুরুব্বিয়ানা ভাবে বললে—“তাই তো, আজকালের ছেলেদের যেন কি হয়েছে! পরীক্ষায় ফেল হলেই নিরুদ্দেশ। আমি সাতবারে ম্যাট্রিক পাশ করেছি, তা ব’লে ত আমি পালিয়ে যাই নি। শেষে বি. এ., এম্. এ. পাশ করেছি একবারে।”

মনে মনে হেসে বললাম,—তুমি আবার এম. এ. পাশ করলে কবে? হয়ত হতেও পারে। বহুদিন দেশে যাই নি কিনা…

ভদ্রমহিলা বললেন—“ভাগ্যিস্ রেডিয়োতে আপনি নিরুদ্দেশের ঘোষণা শুনেছিলেন।”

—“শুধু কি তাই, আনন্দবাজারেও দেখেছি যেন মনে পড়ে।”

"তা হবে।" ব'লেই ভদ্রমহিলা ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললেন—"আপনাদের ঢাকা মেইল কখন ছাড়ে? উনিও এলাহাবাদ থেকে আজই ফিরবার কথা। সেখানে কার কাছে কি উড়ো খবর পেয়ে উনি গেছেন। আমার বড়দিদির মেয়ে বুলু থাকে এলাহাবাদে, তার কাছেও যেতে পারে ভেবে, উনি গেছেন। আর সেখানে গেলে এতক্ষণে একটা খবরও পাওয়া যেত। উনি মিছামিছি গেছেন সেখানে। আমরা আজই যাব। উনি আসুন আর না আসুন, রামদীন যাবে সাথে।"

ঘোষাল বললে—"তা হলে চারখানি রিটার্ণ টিকিট কেনা যাক্...মণ্টু, কত ক'রে না টিকিট? পনেরো টাকা,"...ব'লেই ঘোষাল আমার উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে বললে—"ষাট টাকা টিকিটের আর গোটা দশেক টাকা হাতখরচ লাগবে আর কি! আমি টিকিট কিনে নিয়ে আসি হাজরা রোডের মোড় থেকে।...মণ্টু, তুমি একটু বসো। ওঁর মনটা ভালো নেই, একটু কথাবার্ত্তা বলো।"

ভদ্রমহিলা ভিতরে গিয়ে টাকা এনে দিলেন ঘোষালের হাতে। ঘোষাল ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গেল টিকিট আনতে,—যেন কত গরজ তার ! ভদ্রমহিলাও যেন হাতে আকাশ পেয়েছেন।

আমি সমূহ বিপদ মনে ক'রে, চুপ ক'রে ব'সে আছি। মনে মনে বললাম, আমার আর ভয় কি ! আমি বেগতিক দেখলে সব কথা খুলে ব'লে দেব।

ভদ্রমহিলার সাথে ব'সে কথা বলছিলাম। তিনি আমাকে চা খেতে বললেন। দারোয়ান গেছে 'মিষ্টিমুখে' কি সব আনবার জন্য। কত কৃতজ্ঞতার কথা তিনি বলছিলেন আমার কাছে। ঠিক এমনি সময়ে একখানি ট্যাক্সিতে চেপে কে একজন ভদ্রলোক এসে গেটের কাছে চেঁচিয়ে বললেন—"ওগো খোকাকে পেয়েছি, এই যে এসেছে !"... বলতেই বাড়ীময় একটা হৈ-চৈ সুরু হয়ে গেল। ভদ্রমহিলা আলুথালু বেশে ছুটে গেলেন, ঝি-চাকর সব ছুটে গেল, একটা বিরাট হৈ-চৈ সুরু হল।

আমি অবসর এবং সুযোগ বুঝে দে ছুট্,...

আর কি কথা আছে! ঘোষাল আমাকে আজ কি ফ্যাসাদেই না ফেলেছিল!

পথে এসে একটু দম ছেড়ে নিলাম। ঘোষালের ব্যাপার বুঝতে আমার এক মিনিটও সময় লাগল

"খোকাকে পেয়েছি, এই যে এসেছে।"

না। ভাগ্যিস্ ভদ্রলোক আর একঘণ্টা আগে এসে পৌঁছায় নি। ঘোষালের কপাল বটে!

চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগলাম, দু'মাইলের ভিতর ঘোষালকে কোথাও দেখতে পেলাম না। সে হয়ত তখন কোন রেস্তোরাঁয় ব'সে মজা করছে। বেমালুম ষাট ষাটটি টাকা সে গাফ মেরে দিয়েছে। ছেলেটির নিরুদ্দেশের খবর এবং সে যে এখনও বাড়ী ফিরে আসে নি, ঘোষাল নিশ্চয়ই দু'একদিন আগে এসে খবর নিয়ে গেছে, এবং সে ভালো জানে খোকার বাবা বাড়ীতে নেই!...

ঘোষালের সাথে আর কখনও দেখা হয় নি। দেশে গিয়ে শুনলাম, জোর কপাল তার। কলকাতায় একখানি বাড়ী, গাড়ী এবং লক্ষ টাকার মালিক এখন সে। কোন্ সূত্রে সে এসব পেয়েছে তা' ভগবান ছাড়া কেউ জানে না। গাঁয়ের লোক দেখতে পেলে সে এখন মুখ ফিরিয়ে চ'লে যায়।

পূজা-কন্‌সেসন

হরিহর মিত্তিরের নাম না জানেন কলকাতায় এমন লোক খুবই কম। কারণ লেকে বেড়াতে গেলে তাঁর বাড়ীর সুমুখের মস্ত সাইন-বোর্ডটি নিশ্চয়ই দেখে থাকবার কথা—H^2. Mitter, F. O. T. C. (London). অথচ তিনি স্কুলে সেকেণ্ড ক্লাস অবধি পড়েছিলেন, একথা পাড়ার ভূতনাথবাবুর কাছে কম্‌সে-কম একশ'. দিন শুনেছি। তবু তিনি F. O. T. C. (London)! কতদিন দেখেছি স্কুল-কলেজের ছেলেরা এই উপাধি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে, F. O.…না হয় Fellow of…কিন্তু T. C. ব্যাপারটা কি?—Transfer Certificate? তাদের মাথা ঘামিয়ে যায়।

শেষ অবধি শোনা গেল বিলেতের কোন্ একটা শিশুমঙ্গল সমিতির নিকট হতে বার পেনী দক্ষিণা দিয়ে মিত্তির মহাশয় এই উপাধিটি সংগ্রহ করেছেন। ছোটকাল থেকে তাঁর বি. এ., এম্. এ. হওয়ার খুব

সাধ ছিল ; কিন্তু স্কুলের ইতিহাস, ভূগোল মুখস্থ করার ভয়ে নাকি তিনি বিদ্যালয় ছেড়ে এসেছিলেন। হরিহরবাবু ছা-পোষা লোক। দশ-বারোটি ছেলে-মেয়ে নিয়ে তাঁর সংসার। উপাধিটির পূরোপূরি অর্থ এই—"Father of Twelve children."

আপনাদের বিশ্বাস না হয়, ডিপ্লোমাখানি চার চক্ষে দেখে নিঃসন্দেহ হতে পারেন।

মিত্তির মহাশয় আজ দশ বৎসর যাবৎ কলকাতার বাইরে যাবার ফিকিরে আছেন। যেবার রেল ষ্টীমার কোম্পানীগুলো পূজা-কন্‌সেসন অত্যন্ত লোভনীয় ভাবে দিয়ে থাকেন, সেবার বাড়ীতে একটা-না-একটা অসুখ হয়, না হয় বড় সাহেব সস্ত্রীক শিলং-দার্জিলিঙ ভ্রমণে বার হয়ে যান। হরিহরবাবুকে কলকাতা অফিসে ব'সে ফাইল ঘাঁটতে হয়।

এবার তিন মাস আগে থেকেই হরিহরবাবু ছুটির ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন। গৃহিণী ছেলেপিলেদের স্বাস্থ্যের দিকে কড়া দৃষ্টি রেখে রোজ তাদের স্বাস্থ্যের তদারক করছেন। কারও একদিন একটু

মাথা ধরলে তিনদিনের মত আহার-বিহার একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। উপোসের ভয়ে ছেলেপিলেরা তটস্থ, কিন্তু উপায় নেই ; আজ পনেরো দিন যাবৎ ছেলেমেয়েরা রসগোল্লার মত কুইনাইন পিল, বাসক-সিরাপ—আরও কত কি গলাধঃ করছিল।

পূজোর ছুটির আগের দিন বৈঠক বসল, কোথায় যাওয়া যায়। ছেলেরা ভূগোল খুঁজে ভারতবর্ষে যতগুলো স্বাস্থ্যকর এবং সুপ্রসিদ্ধ জায়গার নাম আওড়াতে পারল, ব'লে গেল। মিত্তির মহাশয় আলবোলা টানতে টানতে তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে সব শুনে গেলেন। গৃহিণী মথুরা, বৃন্দাবনের নামে বার দুই বৃথা ওকালতি ক'রে দেখলেন ; কিন্তু স্বাস্থ্যকর জায়গা চাই, তীর্থস্থান চাই এবং খাদ্য দ্রব্যের দাম সস্তা হওয়া চাই—একাধারে এই তিনের সমাবেশ না হলেও চলবে না এবং গন্তব্যস্থান বাঙ্গালাদেশের খুব কাছাকাছি হওয়া চাই! কারণ তীর্থভ্রমণ এবং জন্মভূমি-দর্শন অর্থাৎ এক ঢিলে দুই পাখী মারবার ইচ্ছায় হরিবাবু এক মাসের ছুটি নিয়েছেন।

. অষ্টম গর্ভের সন্তান হারু ভূগোলের পাতা তন্নতন্ন ক'রে হরিহরবাবুর মনোমত স্থান আবিষ্কার ক'রে ফেলল। শিলং স্বাস্থ্যকর স্থান। পথে পড়বে কামাখ্যা মন্দির, আর চেরাপুঞ্জি শিলঙের খুব কাছাকাছি জায়গা, কমলালেবুর অভাব নেই এবং ঢাকা হতে মোটে চব্বিশ ঘণ্টার পথ। অমনি টাইম টেবিলের খোঁজ পড়ল। রাত্রি বারোটা অবধি জল্পনা কল্পনার পর স্থির হল যে, চেরাপুঞ্জি—শিলং—কামাখ্যা ভ্রমণ শেষ ক'রে একেবারে বিক্রমপুরের বসতবাটিও একবার দেখে আসতে হবে।

... ...

শিয়ালদ' ষ্টেশনে এসে হরিহরবাবুর চক্ষুস্থির। একখানিও রয়েল ক্লাসের গাড়ীও যদি খালি থেকে থাকে! সকলেই দুপুর হতে এসে ব'সে আছে। হরিহরবাবু দমবার পাত্র নন। তিনি সদলবলে গোটা একখানি মধ্যম শ্রেণীর গাড়ী অধিকার ক'রে সেখানে ঘর-সংসার পেতে বসলেন। গাড়ীর ভিতরে চায়ের জল ষ্টোভে ফুটছে, খাবারের তাগিদ আরম্ভ

হবে আর একটু পরেই। কেউ দুধ, কেউ গ্ল্যাক্সো, কেউ হরলিক্স! বড়রা চা-পান হতে সুরু ক'রে দ্বারিকের দোকানের শোন-পাপড়ি পর্য্যন্ত নিঃশেষ ক'রে ছাড়বে, আর কর্ত্তা ও গৃহিণী সের খানেক ছানার মুড়কির সদ্ব্যবহার করবেন।

গাড়ী হু হু ক'রে ছুটে চলেছে। আশে পাশের ছোট ছোট ষ্টেশনগুলো সবুজ নিশান উড়িয়ে আসাম-মেলকে সংবর্দ্ধনা করছিল। পোড়াদ' ষ্টেশনে একজন টিকেট-চেকার এসে উপস্থিত। হরিহরবাবু চুপ ক'রে ব'সে আছেন। চেকারবাবু বললেন—"আপনাকে অতিরিক্ত ভাড়া দিতে হবে।"

হরিহরবাবু অত বোকা লোক নন যে, এক কথাতেই ঝনাৎ ক'রে টাকা ক'টি ফেলে দেবেন। তিনি বললেন—"আমাকে জায়গা দেখিয়ে দিন্, আমরা এখুনিই চ'লে যাচ্ছি।"

চেকারবাবু বিরক্তির সুরে বললেন—"সে আমি কি জানি! টাকা দিন্ মশায়!"

"তবে কে জানে মশায়?" ব'লেই হরিহরবাবু

বিক্রম প্রকাশ ক'রে বললেন—"কি' বললেন, টাকা দেব? হরিহর মিত্তিরকে ঠকিয়ে নেবেন টাকা, পুলিশ অফিসের বড়বাবু হরিহর মিত্তির F.O.T.C. গোদল সাহেবকে কোতল ক'রে ছেড়েছিলাম, আর তুমি এসেছ এখানে ইয়ারকি দিতে"—ব'লেই হরিহর মিত্র চেকারবাবুর গলা টিপে ধরলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাত সাতটি পুত্র হরে, নেড়া, ভেঁটু, গণা, মণি, ভোম্বল ও নয়নচাঁদ বাবাজীরা নাৎসী সৈন্যের মত চেকারবাবুর উপর লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে কিল, চড়, ঘুষি, কানমলাতে তাঁকে অর্দ্ধমৃত ক'রে তুলল। গৃহিণী মাঝখানে প'ড়ে ভদ্রলোকের পৈতৃক প্রাণটা বাঁচিয়ে দিলেন।

গাড়ী ততক্ষণে এসে ঈশ্বরদি জংসনে পৌঁছেছে। একটা মহা হুলস্থূল ব্যাপার। চেকারবাবু পুলিশ ডাকতে গেলেন। মিনিট কয়েক পরে দারোগা, লাল-পাগড়ী, রেলওয়ের লোকজন এসে হাজির। হরিহরবাবু জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রাসভকণ্ঠে বললেন—"বেটা ছোটলোক, ভদ্রমহিলার গায়ে

চেকারবাবুর গলা টিপে ধরলেন

হাত তোল তুমি, কলকাতা ফিরে নিই, কলভিন সাহেবকে ব'লে......"

ষ্টেশন-মাষ্টার বাধা দিয়ে বললেন—"ব্যাপার কি মশাই, বলুন না খুলে!"

কে কার কথা শোনে! হরিহরবাবু অগ্নিশর্ম্মা হয়ে গাড়ীর ভিতরে দাঁড়িয়ে আস্তিন গুটাতে লাগলেন এবং তাঁরই ইঙ্গিতে ছেলেমেয়েরা কোরাস্ সুরে কান্না জুড়ে দিয়েছে। গৃহিণী নথ ঘুরিয়ে বাক্যবাণে সেই চেকারবাবুর চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করছিলেন, এমন সময় ভিড় ঠেলে রামটহল সিপাই আনতমস্তকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম ক'রে বলল—"আরে বড়া বাবু যে, কাঁহাছে আইলবারে!"

রামটহলকে দেখে বড়বাবুর ওরফে হরিহরবাবুর যেন প্রাণে জল এল। হরিহরবাবু নীচে নেমে আসতেই রামটহল তার হাতের লাঠিগাছি ঘুরিয়ে জনতাকে দূরে ঠেলে দিল। দারোগাবাবু বুঝলেন, ভদ্রলোক নিশ্চয়ই পুলিশের লোক এবং রামটহলের জানাশোনা, তিনি বেগতিক দেখে স'রে

পড়লেন। ষ্টেশন-মাষ্টারবাবু কিছু বুঝেও বুঝতে পারলেন না, পরে রামটহলকে জিজ্ঞেস করবেন ভেবে গাড়ী ছাড়বার হুকুম দিলেন।

বেচারী চেকারবাবু মারধর নীরবে হজম ক'রে গেলেন, কিন্তু হেড অফিসে একটা রিপোর্ট না দিয়ে ছাড়বেন না মনে মনে ঠিক ক'রে রাখলেন।...

পার্ব্বতীপুরে গাড়ী বদল ক'রে হরিহরবাবু সপরিবারে হোটেলে গিয়ে উপস্থিত। মোটে চল্লিশ মিনিট গাড়ী থামে সেখানে। এই কয়টি লোকে পঁচিশজনের আহার্য্য পানীয় অনায়াসে গলাধঃ ক'রে ফেলল দেখে হোটেলের মালিক মনোহরবাবুর মাথায় হাত দিয়ে বসবার উপক্রম। হরিহরবাবুর মতে যখন পয়সা ব্যয় ক'রে খাওয়া, তখন পেট ভ'রে খাওয়াই উচিত।...

কামাখ্যা পাহাড়ে তাঁরা এক রাত্রি ছিলেন এবং উমানন্দ, অশ্বক্লান্ত, বশিষ্ঠাশ্রম দেখে তাঁরা শিলং পাহাড়ে এসে পৌঁছেন। শিলঙে দর্শনীয় স্থানগুলো দেখতে মাত্র তাঁদের দু'দিন লেগেছিল।

চেরাপুঞ্জিতে পৃথিবীর সব জায়গার চেয়ে বেশী বৃষ্টি হয়। এজায়গাটি না দেখে গেলেও নয়। অথচ পেট্রল-দুর্ঘটের দিনে যাতায়াতের খরচও নিতান্ত কম নয়। ছেলেরা মনমরা হয়ে গেছে। গৃহিণী রেল-ষ্টীমার-গাড়ী কোনটাই বেশী সহ্য করতে পারেন না, তাই বিশেষ কোন উচ্চ-বাচ্য করেন নি। হরিহরবাবু ঘাবড়াবার লোক নন, তিনি মনে মনে এক বুদ্ধি এঁটে মধ্যাহ্ন-ভোজনের অব্যবহিত পরেই পুলিশ কমিশনারের অফিসের দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগলেন। পথে পচা ঘোষালের ভ্রাতা বংশীরব এবং টিটিরবের কাছে শুনেছেন যে, 'টের্টন্ সাহেব বর্ত্তমানে শিলঙের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা।' আর কি কথা আছে—দে ছুট্, দে ছুট্! পূর্ব্ববঙ্গ আসাম গবর্ণমেণ্টের সময় টের্টন্ সাহেব হরিহরবাবুর হাতধরা লোক ছিল। সুতরাং তার কাছে গেলে চেরাপুঞ্জি-ভ্রমণের একটা সুরাহা হতে পারে, এই কথা তিনি মনে মনে আন্দাজ ক'রে নিয়েছেন।

পুলিশ অফিসে সাহেব-সুবোর ভয়ানক ভীড়।

কেউ বড় একটা সাহেবের কাছে যেতে পারে না, হরিহরবাবু কিন্তু গট্‌গট্‌ ক'রে বিধি-নিষেধ না মেনে (সিংহ রাশি, মঘা নক্ষত্র, আইন-কানুনের বড়-একটা ধার ধারেন না তিনি) চাপরাশীর কাতর অনুনয়-বিনয়ে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে সাহেবের খাস-কামরায় গিয়ে একেবারে সশরীরে হাজির।

সাহেব তখন মেজাজ শরিফে ছিলেন। 'গুডমনিং' শুনতেই ফিরে দেখেন—বহুদিনের বিশ্বস্ত ভৃত্য হরিহর মিত্তির। সাহেব বড় খুশী হলেন। অন্যান্য লোকজন তখন ধীরে ধীরে বার হয়ে গেল। মিত্তির মহাশয় তখন পুরাণো মনিবের কাছে 'ইনাইয়া-বিনাইয়া' কত কি বলতে লাগলেন। সাহেব শুনে আনন্দে ডগমগ হয়ে বললেন—"যখন তোমার যা কিছু প্রয়োজন, আমাকে বলো। ক'দিন থাকবে এখানে? কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?"

হরিহরবাবু এক কথায় জবাব দিলেন—"তোমার দয়ায় সব ঠিক হয়ে যাবে। আসব বৈ কি, দশবার আসব। কোন অসুবিধা নেই।"

সাহেব অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন, হরিহরবাবু অবসর এবং সুযোগ বুঝে জিজ্ঞেস করলেন—"মেম সাহেব কোথায় এবং কেমন আছেন ?"

সাহেব বললেন—"লণ্ডনে আছেন।"

হরিহরবাবু কাঁদ-কাঁদ সুরে বললেন—"বুড়ো বয়সে তাঁকে তুমি বিলেত রেখে এসেছ ? এ কাজ তুমি ভাল করো নি। তাঁকে আসতে লিখে দাও। এই দেখ না, মিসেস্ মিত্তির আমার সঙ্গে এসেছেন। বাব্বা, কলকাতায় যা বোমার ভয় !"

সাহেব শুনে সুখী হলেন এবং প্রত্যুত্তরে বললেন—"আমার নমস্কার জানাবে মিসেস্ মিত্তিরকে।"

হরিহরবাবু মাথা নেড়ে বললেন—"নিশ্চয়ই জানাব।" তারপর একটুখানি ভেবে পুনরায় বললেন—"একটু অনুরোধ জানিয়েছেন তোমাকে, যদি অনুগ্রহ ক'রে......"

সাহেব ব্যগ্র হয়ে বললেন—"কি ?"

—"সাহেব, চেরাপুঞ্জি যাবার একটু ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে।"

"অল্ রাইট"...ব'লে সাহেব একখানি স্লিপ লিখে দিলেন। তাতে শুধু চেরাপুঞ্জি ভ্রমণ নয়, মায় শিলং হতে ঢাকা সহরে আসবার যে সুযোগ ও সুবিধা হয়েছিল, তা এখানে বলবার দরকার নেই।

... ...

ঢাকায় পৌঁছে হরিহরবাবু সদলবলে বিক্রমপুরে যাত্রা করলেন। নৌকোপথে যাতায়াত মন্দ নয় এবং ষ্টীমারের চেয়ে কম ভাড়া লাগবে, এই জন্য তিনি নৌকোয়ই যাওয়া স্থির করলেন।

দশমীর চাঁদ। কলকল ছলছল শব্দে জোয়ারের জল ছুটে চলেছে। স্রোতের জলে নৌকো ছুটছে, আর মাঝিরা দিব্য আরামে ব'সে ব'সে নগদ পাঁচ পাঁচটি টাকা গাফ মেরে দেবে, এ হরিহরবাবুর অসহ্য। তিনি মাঝিদিগকে বিষম তাড়া দিতে লাগলেন, ঠিক এমন সময় ছপ্ ছপ্ শব্দে একখানি ছিপ এসে তাঁদের নৌকোর কাছে ভিড়ল। কাছাকাছি আসতেই ছিপখানি হতে কে যেন গর্জ্জে উঠল—"এই নৌকো থামাও, আমরা জল-পুলিশ। নৌকো তল্লাস করব!"

হরিহরবাবু পুলিশের লোক, সহজে পিছু হটতে জানেন না। প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধিও তাঁর কম নয়! হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—"আমরাও স্থল-পুলিশ। দূর থেকেই বিদায় নিন্ মশায়! চালাকী করবার আর জায়গা পেলেন না।"

আবার কে যেন চীৎকার ক'রে উঠল—"সাবধান, নৌকো থামাও।"

নৌকো জোয়ারের মুখে ছুটে চলছিল, মাঝিরাও খুব জোরে বৈঠা টানছিল। কিন্তু ডাকাতের দল এতেও নিরস্ত হল না, প্রাণপণে বিপুল জলরাশি ঠেলে তারা যেন ছুটে আসতে লাগল।

ব্যাপার গুরুতর দেখে হরিহরবাবুর মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর তৃতীয় পুত্র গণার এয়ার গানটি বার ক'রে নদীবক্ষ প্রকম্পিত ক'রে 'গুড়ুম্ গুড়ুম্' শব্দে ফাঁকা গুলি ছুঁড়তে লাগলেন। ছেলেরা কালীপূজোর জন্য আতসবাজি, তুবড়ি, জলবোমা প্রভৃতি ঢাকা হতে চুপি চুপি কিনে এনেছিল। তারাও হরিহরবাবুর

দেখাদেখি জাপানী গরিলা সৈন্যদের মত অকস্মাৎ

জলবোমা, ছুঁচোবাজি যুগপৎ সেই নৌকোর মাঝখানে

ছুঁড়ে ফেলতেই, "ওরে বাবারে, গেলামরে, রক্ষা করো" আর্ত্তনাদে একটা বিরাট হৈ-চৈ সুরু হয়ে গেল। হুড়োহুড়ি, মারামারি, মাঝি-মাল্লার কাতর ক্রন্দনে এবং লোকজনেরা ভয়ে নৌকো হতে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ায়, নৌকোখানি একেবারে কাৎ হয়ে জলে ডুবে গেল। কত লোক ডুবল, প্রবল স্রোতের টানে কোথায় ভেসে গেল, কিছুই দেখা গেল না।

ততক্ষণে তারা একটা গঞ্জের কাছাকাছি জায়গায় এসে পৌঁছেছে। মাঝিরা বলল—"বাবু, আজ রাতটা এখানেই থাকা যাক। কাল ভোর নাগাদ পৌঁছে দেব আপনাদের। মাত্র দেড় ক্রোশ পথ এখান থেকে। শেষরাত্রিতে নৌকো ছেড়ে যাব।"

হরিহরবাবু ভাল-মন্দ কিছু বললেন না। ছেলেরা চেঁচিয়ে উঠল—"বাবা, ক্ষিধে পেয়েছে।"

গৃহিণী বললেন—"ক্ষিধে পাবে না কেন বলো! সেই কখন দুটি মুখে গুঁজে বেরিয়েছে।"

হরিহরবাবু জিজ্ঞেস করলেন—"এখানে কিছু পাওয়া যাবে, মাঝি ?"

মাঝি বলল—“সবই পাওয়া যাবে হুজুর।”

—“আচ্ছা, এখানে কাছে কোনও থানা আছে?”

—“না, হুজুর!”

—“তবে বাজারে মহাজনদের দোকান-ঘর আছে এখানে?”

—“আজ্ঞে।”

হরিহরবাবু মাঝির সাথে উপরে উঠলেন। হাঁকডাক ক’রে জনকয়েক দোকানদারকে ডেকে উঠালেন। তাঁর খাকী রঙের পোষাক, বিরাট চেহারা এবং কথার চালচলনে ভীত-সন্ত্রস্ত দোকানদারেরা যে যা সুবিধামত পারল, নৌকোয় রাশি রাশি আহার্য্য, খাবার পাঠিয়ে দিতে লাগল। অন্ততঃ হরিহরবাবুর হাবভাবে তিনি যে এ মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হাকিম, একথা তারা মনে মনে ঠিক ধ’রে নিল। তারপর চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় দুপুর রাত্রিতে হরিহরবাবু সপরিবারে মহানন্দে সেই গঞ্জের ঘাটে ব’সে উপভোগ করতে লাগলেন।

শেষরাত্রে নৌকো ছেড়ে মাঝিরা পাল তুলে

দিয়েছিল। তারাও নৈশ-ভোজন প্রচুর পরিমাণে সুসম্পন্ন করেছিল।

বহুদিন পরে হরিহরবাবু দেশে এসেছেন, গ্রামে বিষম সোরগোল প'ড়ে গেছে। কিন্তু হতভাগ্য সেই ডাকাতদের কথা এবং গঞ্জের দোকানদারদের আতিথেয়তার কথা হরিহরবাবু এজীবনে ভুলতে পারবেন কিনা সন্দেহ।

বাকী ছুটিটা স্বদেশে আরামে কাটিয়ে হরিহরবাবু এতদিনে নিশ্চয়ই গন্তব্য স্থানে এসে পৌঁছেছেন। যুদ্ধের বাজারে যে পূজা-কন্‌সেসন নেই, একথা তিনি প্রায় ভুলে গিয়েছিলেন। আবার পূজার কন্‌সেসন টিকিট হলে তিনি একবার পশ্চিমে ঘুরে আসবেন, এ-বিষয়ে গৃহিণীকে বারংবার আশ্বস্ত করেছেন।

শেষ